ষষ্ঠ অধ্যায়

নিজের জীবনদর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধ : জীবন দর্শনের নির্মাণ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে নিজের জীবনদর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধ। *আমার লেখক সত্তা, আমার জীবন দর্শন, কর্মজীবনের সূত্রপাত, আমার ধর্ম জিজ্ঞাসা, আর্ট, শিল্পীর স্বাধীনতা, আমার সাহিত্যিক বিকাশ, লেখক হওয়ার ইতিকথা, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, বিনুর বই, জীবন যৌবন, নিজের কথা* ইত্যাদি প্রবন্ধের বাইরেও কিছু কিছু সাক্ষাৎকারেও মিলে তাঁর জীবনের চড়াই উতরাই এর ঘটনা। তিনি কোন কোন ঘটনার জন্য লেখক হয়ে উঠলেন কিংবা তাঁর জীবন দর্শন কী করে গড়ে উঠল, সব কিছুর উত্তর মেলে উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে। যেমন *বিনুর বই* -এ লেখকের জীবনের চেয়ে মনের কাহিনীই বেশি করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রন্থে মেলে জীবন ও শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, বিনু যেন সমস্ত সচেতন শিল্পীরই প্রতিনিধি। বিনুর বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা শিল্প সাহিত্য নিয়ে চিন্তাভাবনার চেয়ে বিনুর জীবনের ঘটনাবলীর চিন্তা-ভাবনাই বেশি পাই। তবে নিজের জীবনী যেন নিজেই লিখেছেন। এতে রয়েছে প্রাবন্ধিকের কর্মজীবনের নানা সংকটের চিত্র। সাম্প্রদায়িক বাস্তবতার কথা, জাতীয়দাবাদী রাজনীতির কথা, জীবনদর্শনের ও জীবনকে শিল্পের মতো করে গড়ে তোলার নিটোল ইতিহাস। *আই.সি.এস.স্বাধীনতার পূর্বাভাষ*, আর *জীবন যৌবন*-এর মধ্যে প্রথম দুটিতে কর্মজীবনের প্রসঙ্গ এবং শেষেরটিতে সাতচল্লিশ বৎসরের স্মৃতিচারণ রয়েছে। আবার বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিখ্যাত লেখকদের পড়া পড়ে কীভাবে তাঁর লেখকসত্তা গড়ে উঠেছে তারই বৃত্তান্ত রয়েছে *আমার লেখক সত্তা* নামক প্রবন্ধে। তিনি যে জীবন শিল্পী ও লেখনশিল্পী, তার কথা তিনি *নিজের কথা* নামক প্রবন্ধে বলেছেন। অন্যদিকে তাঁর চুয়াল্লিশ বছর ধরে অন্বেষণ, অনুভব ও অনুশীলনের ফসল *আর্ট* নামক গ্রন্থটি।

এবার বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে, তাঁর জীবনদর্শন নির্মাণের ইতিহাস। প্রথমেই আলোচনা করব তার আত্মচরিত *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি* নিয়ে। ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতার পূর্বাভাষ নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তা ১৯৮৯ সালে যুক্তবঙ্গের স্মৃতি নামে পুনঃপ্রকাশ হয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায়— ''প্রকারান্তরে এটি আমার আত্মচরিত, সেই সময়ের, যে সময় আমি ছিলুম পূর্ববঙ্গে নয় বছর ও পশ্চিমবঙ্গে নয় বছর। তেমনি শাসন বিভাগে নয় বছর ও বিচার বিভাগে নয় বছর।''[১]

প্রাবন্ধিক যুক্তবঙ্গের প্রতি এক প্রকার নসটালজিয়া বোধ করেন। কারণ সেখানে তিনি পরাধীন ছিলেন, পরাধীনতা সুখের নয়, কিন্তু পরাধীনতাই একমাত্র সত্য ? রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ,

চট্টগ্রাম, কুমিল্লার স্মৃতি প্রাবন্ধিক ভুলতে পারেননি। কারণ স্মৃতি সতত সুখের। কিন্তু যুক্তবঙ্গের স্মৃতির ইতিহাসটা পরিষ্কার করে বুঝতে গেলে প্রাবন্ধিকের যুক্তবঙ্গের স্মৃতির 'পূর্ব ভূমিকা' অংশটি জেনে নেওয়া দরকার— ''স্বাধীনতার পূর্বে আমি ছিলুম অবিভক্ত বঙ্গের প্রশাসনে কর্মরত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। আমার ব্রিটিশ আমলের কার্যকাল ছিল প্রায় আঠারো বছর। তার অর্ধেকের উপর কাটে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সেদিনকার পূর্ববঙ্গ কোথায় মিলিয়ে গেছে। সেই নামে কোনও অঞ্চল বা প্রদেশ আর নেই। যা আছে তার নাম বাংলাদেশ। যা গেছে তার স্মৃতি আমার কাছে চিরমধুর। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। যৌবনকে স্মরণ করতে গেলে পূর্ববঙ্গকেও স্মরণ করতে হয়। এই মনে করে আমি একদিন লিখতে বসি 'পূর্ববঙ্গের স্মৃতি'। কয়েকটি কিস্তি সেই নামেই শারদীয় 'উল্টোরথে' বেরোয়। সেই নামে শেষ করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু একদিন শারদীয় 'যুগান্তর'-এর তরফ থেকে প্রফুল্ল রায় চান শেষের অংশ। তাঁরই অনুরোধে নামান্তর হয় 'পূর্বাভাষ'। অর্থাৎ দেশ কেমন করে দু'ভাগ হলো তারই পূর্বাভাষ। সেই সূত্রে 'পূর্ব'কে রক্ষা করা গেল, কিন্তু 'বঙ্গকে' নয়। দেশ কেমন করে ভাগ হলো সেকথা বিশদ করতে হলে শুধু পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা কেন পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতাকেও ঠাঁই দিতে হয়। নইলে প্রায় ছ'বছরের ফাঁক থেকে যায়। সুতরাং লিখতে হলো 'অর্ন্তবর্তী কাল'। শারদীয় 'হিমাদ্রি'র জন্যে। পূর্ব পশ্চিম মিলিয়ে অবিভক্ত বঙ্গের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি। বাদ পড়ল আমার চাকরির গোড়ার দিকে পৌনে দুই বছর। যখন আমি মুর্শিদাবাদের ও বাঁকুড়ার অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেটুকু না লিখেই লেখাগুলি সাজিয়ে বই করে বার করতে দিই শৈব্যা পুস্তকালয়ের রবীন্দ্রনাথ বলকে। তিনি বলেন 'পূর্বভাষ' নামে তো অন্য একজনের একখানা উপন্যাস আছে, একই নামে বই করার চেয়ে নাম পালটে দেওয়াই ভালো। তিনিই প্রস্তাব করেন 'স্বাধীনতার পূর্বাভাষ'। আমি সে প্রস্তাব সমর্থন করি। দেশভাগ আর স্বাধীনতা একই দিনে ও একই ক্ষণে সম্পন্ন হয়। উভয়েরই প্রস্তুতি দীর্ঘকাল জুড়ে। সুতরাং এই নামটিও অযথা নয়। বই ছাপা প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় খেয়াল হয়, পশ্চিমবঙ্গই যদি থাকে তবে চাকরির শুরু থেকে কেন নয়? আদিপর্ব ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ কেন বাদ পড়ে? তাতেও তো স্বাধীনতার পূর্বাভাষ। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ, ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন, লবণ সত্যাগ্রহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, এসব কি স্বাধীনতার পর্বাভাষ নয়? তাই 'সূত্রপাত' রূপে আরও একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে দিচ্ছি।"[২]

যুক্তবঙ্গের স্মৃতি অন্যদিক থেকে *আই.সি.এস* বই এর পরিপূরক বলাই সঙ্গত মনে হয়। আর যুক্তবঙ্গের অনেক কথাই আমরা জীবন যৌবন নামক গ্রন্থে পাই। যেটাকে প্রাবন্ধিক 'জীবনস্মৃতি' বলেছেন।

তবে যুক্তবঙ্গের স্মৃতিকে প্রাবন্ধিক আত্মচরিত বলেছেন ঠিকই তবে তা তাঁর কর্মজীবনের এক বিশেষ পর্বেই সীমাবদ্ধ। বাংলা দ্বিখণ্ড হল কেন এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিমত হল— ''জমিদার প্রজার বিরোধটা হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নয়। অথচ ওটাকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বলে চালিয়ে দিয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি তথা কায়েমী স্বার্থের ধারক। কুষ্টিয়ায় থাকতে আমি লক্ষ্য করিনি বিরোধটা তলে তলে কতদূর গড়িয়েছে। কুষ্টিয়ার পর নদীয়া জেলার কলেকটর হই। তারপর ছুটি নিই। ছুটির পর রাজশাহী জেলার কলেকটর হই। তখনই বুঝতে পারি শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপ নিচ্ছে। কুষ্টিয়ায় আমি ১৯৩৫-৩৬ সালেও মুসলমান ভদ্রলোকেদের ধুতি পরতে দেখেছি। আমার চাপরাশী বাদল যে মুসলমান এটা আবিষ্কার করতে আমার লাগল দেড় বছর। নওগাঁতেও দেড় বছর লেগেছিল সুখলাল যে মুসলমান এ তথ্য আবিষ্কার করতে। ধর্মে আমরা যে যাই হই না কেন আর সব বিষয়ে আমরা বাঙালী, একে হাজার চেষ্টা করলেও উড়িয়ে দিতে পারা যাবে না। অথচ একে স্বীকার করতেও কায়েমী স্বার্থে বাধবে। তবে ধর্মের যে কতখানি জোর এটা আমি চল্লিশ বছর আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। ভিতরে ভিতরে আমি নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠেছিলুম ও তলে তলে আমার অনুরাগ ছিল সোভিয়েট কমিউনিজমের উপর। ধর্ম কি? সে তো জনগণের আফিং। আর আমরা বুর্জোয়ারাও ইচ্ছা করলে ফরাসীতে যাকে বলে 'দেক্লাসে' বা শ্রেণীহারা হতে পারি।একবার ট্যুরে গিয়ে দেখি একই গ্রামে দুটি মসজিদ। মাঝখানে দূরত্ব বেশি নয়। জানতে চাই দুটি মসজিদ কেন। তখন একজন মোড়ল এর উত্তরে বলেন, ''আমরা গেরস্তী। ওরা জোলা। ওদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতা নেই। সেজন্যে আলাদা মসজিদ।''[৩]

এছাড়া ১৯৩৭ সালে রাজশাহী জেলার কলেকটর হন প্রাবন্ধিক। তখন তিনি বুঝতে পারেন শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপ নিচ্ছে। এবারে যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, জীবন যৌবন ও আই.সি.এস-এর থেকে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুদিক এখানে তুলে ধরবো। এই তিনটির মধ্যে একটি মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে—

''স্বাধীনতার পূর্বাভাষ নামে যা ১৯৭৯ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তার ১৯৮৯ সালে পুনঃপ্রকাশ হয় যুক্তবঙ্গের স্মৃতি নামে। নতুন সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'প্রকারান্তরে এটি আমার আত্মচরিত, সেই সময়ের, যে সময় আমি ছিলুম পূর্ববঙ্গে নয় বছর ও পশ্চিমবঙ্গে নয় বছর।'' তখনকার কালে পূর্ববঙ্গ বলতে বোঝাত পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বাংলার অংশকে আর পদ্মার পশ্চিম তীরের বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গ। এটা ছিল ভৌগোলিকভাবে ভাগাভাগি। আরও যোগ করেন, 'সেই সময়টার উপর যবনিকা পড়ে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭। একই সঙ্গে শেষ হয় ব্রিটিশ

আমল ও লোপ পায় যুক্তবঙ্গ। আর সেই সঙ্গে আমার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ। কারণ সার্ভিসটাকেই ইংরেজরা গুটিয়ে নেয়।' অর্থাৎ এক হিসেবে এ-বই আই সি এস বইখানির পরিপূরক। একে যে লেখক 'আত্মচরিত' বলেছেন, সেটা শুধু তাঁর কর্মজীবনের এক বিশেষ পর্বেই সীমাবদ্ধ। বাংলা দ্বিখণ্ড হল কেন এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অভিমত হচ্ছে, 'জমিদার প্রজার বিরোধটা হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নয়। অথচ ওটাকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বলে চালিয়ে দিয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি তথা কায়েমী স্বার্থের ধারক।

'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি'র অনেক কথাই ফিরে এসেছে *জীবনযৌবন*-এ। ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন, 'এই গ্রন্থ আমার আত্মচরিত নয়, জীবন স্মৃতি।' যুক্তবঙ্গের স্মৃতি-র অতিরিক্ত অংশ হল তাঁর শৈশব-বাল্য থেকে ইংল্যান্ড প্রবাস পর্যন্ত এবং দেশ ভাগের পর থেকে অবসর নেওয়া পর্যন্ত সময়কালের স্মৃতি। তা ছাড়া এ গ্রন্থে আছে অনেক ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি ও স্মৃতিচারণ, অনেক ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের পাশাপাশি আছে শ্বেতাঙ্গ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বারবার বিরোধের স্মৃতি এবং তার উপরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একান্তে ট্রেন ভ্রমণের ও সরকারি শৃঙ্খলা ভেঙে পাশের জেলাতে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি। তার সঙ্গে আছে জেলা জজের বাংলোতে খাদি কেন্দ্র স্থাপনায় সরকারি সহিষ্ণুতার কথা। ব্রিটিশ আমলের অন্তিম বছরগুলির সামাজিক ও অংশত রাজনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নের বহু উপাদান জীবনযৌবন-এ পরিকীর্ণ এবং তেমন ইতিহাস রচনার জন্য জীবন যৌবন অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। তবে এ গ্রন্থের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অংশ বোধহয় স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে সীমান্তবাসী সংখ্যালঘুদের বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের তীব্র মত পার্থক্যের বৃত্তান্ত। অকাল অবসরের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পরের ছ মাসের ঘটনাও নাটকীয়তাপূর্ণ কারণ এই পর্বেই তাঁকে জুডিসিয়াল সেক্রেটারির কার্যভার পালন করতে হয় আর তা করতে গিয়ে তাঁর চাকরি জীবনের একুশ বছর পূর্ণ হয়, ফলে আনুপাতিক নয়, পুরো পেনশনই প্রাপ্য হয়। অকাল অবসর নিয়েই শেষ করেছেন জীবনযৌবন।"[৪]

বাংলাদেশের প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশবশত লিখেছেন— ''বাংলাদেশে নিযুক্ত হবার আগে আমি চিনতুম দুটি মাত্র স্থান। কলকাতা আর শান্তিনিকেতন। একটা রাত সিউড়িতে কাটানো ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের 'সীতা' অভিনয় দেখা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নিযুক্তির পর এক এক করে অনেকগুলি জেলায় কাজ শিখি ও কাজ করি। মুর্শিদাবাদ। হুগলী। বাঁকুড়া। রাজশাহী। চট্টগ্রাম। ঢাকা। আবার বাঁকুড়া। আবার নদীয়া। বীরভূম। ময়মনসিং। হাওড়া। এই খানে অবিভক্ত বাংলায় ছেদ। অতঃপর কলকাতা। আবার মুর্শিদাবাদ। আবার কলকাতা। এইখানে চাকরিতে ছেদ। দেশ দেখা কেবল প্রকৃতিকে দেখা নয়, মানুষকেও দেখা। কার আকর্ষণ বেশি? প্রকৃতির না মানুষের?

এর উত্তরে আমি বলব সমান সমান। কিন্তু আমার লেখায় প্রকৃতির বর্ণনা তেমন থাকে না। এর কারণ অত ঘোরাঘুরি করলে ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপে। নদীয়ার ছবি আঁকতে গিয়ে হয়তো রাজশাহীর ছবি আঁকব। রাজশাহী ছবি আঁকতে গিয়ে হয়তো মুর্শিদাবাদের। মানুষ আঁকতে গেলেও যে সেকথা খাটে না তা নয়। তবে আমি যাদের কথা লিখি তারা ব্যক্তি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্থান অনুসারে বদলায় না। কথ্য ভাষা বদলাতে পারে। প্রথা বদলাতে। কিন্তু বাঙালী মোটের উপর বাঙালী।"[৫]

প্রাবন্ধিকের ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ছিল জীবনের সৃষ্টিশীলকাল। জীবনের ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি প্রাবন্ধিক পূর্ববঙ্গে কাটিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে— ''এত সেবা করেও হিন্দুরা মুসলমানদের হৃদয় জয় করতে পারে নি। করতে পারলে কংগ্রেস টিকিটে মুসলমান প্রার্থী জয় লাভ করতে পারত। যেমন দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।"[৬] প্রাবন্ধিকের ভাষায়—

''একদিন শান্তিনিকেতন থেকে আরনল্ড বাকে সাহেব গিয়ে লোকসংগীতির রেকর্ড করতে চান। ভাগ্যক্রমে মনসুরউদ্দীন সাহেব ছিলেন সেখানকার স্কুল সাব ইনস্পেক্টার। লোকগীতি সংগ্রহ করা তাঁর বাতিক। তিনিই নিয়ে এলেন কোন্‌খান থেকে এক ফকিরনীকে। সে একটারপর একটা গান শোনায় আর সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যায়। যন্ত্র থেকে আবার বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই ফকিরনীর মুখেই প্রথম শুনি—

''প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু লহ চিনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি
এক মরণে দু'জন মল রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।"

আমার সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও বিরাম ছিল না। ''যার যথা দেশ" নওগাঁ থাকতেই শেষ করি। সেইখানেই আমার প্রথম সন্তান পুণ্যশ্লোক ভূমিষ্ঠ হয়। জনভোজ দিতে চেয়েছিলুম। হেড ক্লার্ক হেমবাবুর পরামর্শে যাত্রা দেখতে দিই। বহুদূর থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। পুণ্যকে নিয়ে যখন সফরে যাই যারা দেখে তারা বলাবলি করে, এই সেই ছেলে যার জন্যে যাত্রা দেখতে গেলুম।"[৭]

নওগাঁ মহকুমার জন্য প্রাবন্ধিকের ছিল নানারকম পরিকল্পনা। ''নওগাঁয় আমি তো বেশ জমে গেছলুম, মহকুমার জন্যে কতরকম পরিকল্পনা ছিল আমার মাথায়। গাঁজা মহালের তিনটে হাইস্কুলের কোনটাই ভালো চলছিল না। তিনটে হাইস্কুলের উপরের দিকে ক্লাসগুলোকে নিয়ে

চতুর্থ একস্থানে কেন্দ্রীয় হাইস্কুল পত্তন করা ও নিচের দিকের ক্লাসগুলোকে যথাস্থানে রেখে তিনটে মাইনর স্কুলে পরিণত করা, এটা আমার আইডিয়া নয়, গাঁজা সোসাইটির চেয়ারম্যান অর্থাৎ রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিনেলের। তা হলে সোসাইটির অর্থসাহায্য কেন্দ্রীভূত হতো ও তার ফলে শিক্ষার মান উন্নত হতো। আমার উপর পরিচলনার ভার ছেড়ে দেওয়ায় আমি তার সঙ্গে আমার নিজের আইডিয়া জুড়ে দিই। কৃষিকে করি উপরের দিকের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। আমার বিশ্বাস ছিল বিষয়টা ঐচ্ছিক হলেও আবশ্যিকের মতোই কাজ দেবে। ছাত্ররা প্রায় সবাই চাষী গৃহস্থের পুত্র। চাষ কেমন করে আরও বৈজ্ঞানিক ও আরও লাভজনক হয় সেটা তাদের ঘরের দোরগোড়ায় তারা নিখরচায় শিখতে পারবে। চাকরির জন্যে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হবে না। গাঁজার মরসুম যখন থাকবে না তখন অন্য ফসল ফলিয়ে অর্থবান হবে।”[৮]

এরপর প্রাবন্ধিককে বদলি করা হয় বসির হাটে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে। যদিও সেটা সাহিত্যের দিক থেকে ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু পরে তিনি জানতে পান যে তাঁর বয়সের চারজন অফিসারকে জুডিসিয়াল ট্রেনিং দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলা দপ্তরে। সুতরাং তাকেও যেতে হবে চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের মতো সুন্দর নিসর্গ প্রাবন্ধিক আকৃষ্ট করেছিল। নওগাঁ থাকতেই তিনি *যার যেথা দেশ* লিখেছেন। আর *অজ্ঞাতবাস* শেষ করেন চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। প্রাবন্ধিক মাঝে মাঝে চারুবাবু ও মোহিতবাবুর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রাবন্ধিকের ভাষায়— ‘‘আমার সব চেয়ে ভালো লাগত চারুবাবুকে। তিনি কারও সমালোচনা করতেন না। মিষ্টভাষী নিরহঙ্কার মানুষটি, নিজের সৃষ্টির কাজ নিয়েই ব্যাপৃত, পরের অনাসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন বা নীরব। প্রায়ই বলতেন শরীর শ্রান্ত, আর বইতে পারছেন না। আমার প্রথম লেখা বেরোয় ‘প্রবাসী’তে। চারুবাবু নিজের হাতে পোস্টকার্ড লিখে জানান যে মঞ্জুর হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সেটা একটা উৎসবের দিন।”[৯]

প্রাবন্ধিক অনেক স্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে কুষ্টিয়ায় বদলি হন। তিনি থাকেন দেরাদুনে। ফিরে আসার সময় তিনি দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে আসেন। আবুল ফজল সাহেবের লেখা পড়ে প্রাবন্ধিক মুগ্ধ হন— ‘‘আবুল ফজল সাহেবের লেখা আমি আগেই পড়েছিলুম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল ওটি একজনের ছদ্মনাম। একদিন তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর ও আমার সাহিত্যিক বন্ধু মাহবুবউল আলম সাহেব। সত্যিই তাঁর নাম আবুল ফজল। তাঁর ছোটগল্প আমার ভালো লাগে। আমি তাঁকে বলি খাঁটি চাটগেঁয়ে উপভাষায় লিখতে। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, কিন্তু ওই একটিবার। আর নয়। কারণ সে ভাষা দুর্বোধ্য। গল্পটির নাম *রহস্যময়ী প্রকৃতি*।

‘বুলবুল’ পত্রিকায় ‘মোমিনের জবানবন্দী’ পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। সেই থেকে মাহবুবউল আলম আমার প্রিয় লেখক। একদিন তিনি এসে আলাপ করে যান।”[১০]

প্রাবন্ধিক এরপর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রবক্তা মোতাহার হোসেন চৌধুরীর কথাও আমাদের জানিয়েছেন এই গ্রন্থে—''কুমিল্লায় থাকতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মোতাহার হোসেন চৌধুরী। অসাধারণ সংস্কৃতিবান পুরুষ। জানতুম না যে তিনি ছিলেন ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন প্রবক্তা। আবুল ফজল সাহেবের সমবয়স্ক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের মতো সংস্কারমুক্ত। মনে প্রাণে বাঙালী। আলোচনার সময় আমার লেখার প্রসঙ্গই তুলেছিলেন, নিজের লেখার কথা বলেননি। লিখতেনও না তেমন বেশি যে নজরে পড়বে। পাকিস্তানী আমলে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রকাশিত হয়। অপূর্ব গদ্যশৈলী।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন এই গ্রন্থে— ''রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাগত করেন। আমার স্ত্রীকে বলেন, ''শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠ মেয়ে। তোমার ইচ্ছামতো কাজ বেছে নাও। এখানে কত রকম বিভাগ। কত রকম কাজ।'' আর আমাকে যা বলেন তার মধ্যে কাজের ইঙ্গিত নেই, যেন লেখাই আমার একমাত্র কাজ ও তাতেই সংসার চলবে। দিনকয়েক পরে কথাবার্তা হতো, কিন্তু তার আগেই বিশ্বভারতীর গ্রীষ্মাবকাশ ও কবির কালিম্পং প্রস্থান। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন নিচু বাংলার কাছাকাছি একটি বাসা। সেখানে মালপত্তর আঁটে না, তাই বিশ্বভারতীর গুদামে জায়গা দেন। ছেলেমেয়েদের হুপিং কফ হয়েছিল কুমিল্লাতেই, তা নিয়ে ভাবনায় পড়েছি দেখে প্রতিমা দেবী বলেন শ্রীনিকেতনের প্রধান ভবনের তিনতলার অতিথিশালায় বাস করতে। শান্তিনিকেতন তথা শ্রীনিকেতনের কর্মীদের কাছ থেকেও সৌজন্য আর সহানুভূতিই পাই। যাঁদের প্রতিবেশী হই তাঁরাও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন। সবাই চান যে আমরা থেকে যাই।"[১২]

এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি আমাদের আরো কিছু স্মৃতি ভাগ করেছেন। বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকা যোগ দেওয়ায় মানব জাতিও দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল। তাঁতে মহাত্মাগন্ধীর ছিল আন্তরিক অসম্মতি। প্রাবন্ধিকের কথায়— ''ওদিকে বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকা যোগ দেওয়ার মানব জাতিও দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল। তাতে মহাত্মাগান্ধীর আন্তরিক অসম্মতি। কতক লোককে যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে দাঁড়াতে হবে, নইলে মধ্যস্থ হবে কারা, শান্তি স্থাপন করবে কারা? তিনি স্বয়ং সেইরূপ একজন ব্যক্তি। কিন্তু কংগ্রেস কি সেইরূপ একটি দল? ভারত কী সেইরূপ একটি দেশ? কংগ্রেস নেতারা যদিও ব্যক্তিসত্যাগ্রহ বরণ করে কারাবাসী, তবু তাঁদের শর্ত মেনে নিলে যুদ্ধে অংশে নিতে তাঁরাও রাজী। তাঁরা যদি অংশ নেন তবে ভারতের জনগণও অংশ নেয়। গান্ধীজীর তা হলে স্থিতি কোথায়? সকলেই বুঝবে যে হতো। নবজাত কন্যা তৃপ্তিকে নিয়ে তার মা অতদূর যেতে পারবেন না বলেই মাসখানেক সময় চাই।"[১৩]

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর পদার্পণ শান্তিনিকেতনে। প্রাবন্ধিকের বন্ধুর জন্যই তিনি গান্ধীজীর

সাথে দেখা করার সুযোগ পান মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য। গান্ধীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে রসিকতার ছলে কথা বলেছিলেন। এরপরের কথা প্রাবন্ধিকের সুরেই শোনা যাক—

''প্রায় ছ'বছর পরে পূর্ববঙ্গে ফেরা। পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যুদ্ধে মানুষ মরেনি, কিন্তু পোড়ামাটি নীতির অপপ্রয়োগে মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে। এত প্রাণ ইংরেজরাও দেয়নি, ফরাসীরা তো নয়ই, মার্কিনরাও না। যুদ্ধে না হলেও যুদ্ধের দরুন এই বিপুল প্রাণদান কি ব্যর্থ যাবে? দেশ স্বাধীন হবে না? হবে যে তার আভাস পাওয়া যায় নৌসেনা বিদ্রোহে। সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে ক্যাবিনেট মিশন এসে হাজির। যে প্রস্তাব এঁরা নিয়ে আসেন সেটা স্বাধীনতারই প্রস্তাব। যদি কংগ্রেস ও লীগ নেতারা একমত হন। কিন্তু দ্বিমত হলে কী হবে? অনির্দিষ্টকাল বড়লাটের শাসন? তাঁর শাসন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের অবস্থান? প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীদের প্রত্যাবর্তন? তা দেখে জিন্না সাহেবের উষ্মা? তবে ইতিমধ্যে তিনি বাংলা ও সিন্ধু এই দুটি প্রদেশ শাসনের উপযোগী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। আর পাঞ্জাবেও তাঁর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি। কেন্দ্রেও লীগ বহির্ভূত মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা কমতে কমতে একটি কি দুটিতে ঠেকেছে। কংগ্রেস শাসিত হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেও মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে। সেখানে খান আবদুর গফ্ফার খান চিরউন্নত শির।''[১৪]

এরপর লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করেন তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেই একদল বলেন, ''বঙ্গভঙ্গ ভালো নয়, কারণ বাঙালীরা এক নেশন।''[১৫] জিন্না সাহেবও লর্ড মউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৭ সালে তাই বলেন। প্রাবন্ধিক বলেন—

''জিন্না সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের আজম সাহেব যা বলেছিলেন— গুডস ডেলিভার করা। মুসলিম লীগের টিকিটধারীদের তিনি ভোটে জিতিয়ে দেন। জিতিয়ে দেন বিহারে, যুক্ত প্রদেশে, বম্বেতে, মাদ্রাজে, যেসব প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা নয়। পাকিস্তান হাসিল হলে তাঁদের কী লাভ? তাঁরা কি তাঁদের ভোটারদের সেদেশে নিয়ে যাবেন ও ঘরবাড়ি জায়গাজমি বিষয়-আশয় পাইয়ে দেবেন? লাভ যদি কারও হয় তো বাঙালী বা পাঞ্জাবী মুসলমানদের। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় জিন্না সাহেবের পেছনে মুসলিম লীগ সদস্যদের সারিবদ্ধ সমর্থন আবশ্যক ছিল। কংগ্রেস লীগ মিলিত সরকার গঠিত হলে কংগ্রেসের গোষ্ঠীতে যেন একজনও মুসলমান না থাকেন। থাকলে তো দেখা গেল যে কংগ্রেস গুডস ডেলিভার করতে পারে। পুরোপুরি সফল না হলে জিন্না সাহেব সেক্ষেত্রে মোটামুটি সফল হন।''[১৬] এবং শেষ পর্যন্ত প্রাবন্ধিকের মন্তব্য— ''শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট করতেই হবে, আর অপেক্ষা করা চলবে না।

কংগ্রেসকেই আহ্বান করা হোক বড়লাটের শাসন পরিষদ মন্ত্রিমণ্ডলের ছাঁচে গঠন করতে। কংগ্রেস লীগকে রাজী করানোর ভার নেবে। জিন্না সাহেব এর পূর্বভাষ পেয়ে উল্টো চাল চালেন। তিনি লীগের কর্মকর্তাদের ডেকে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন যে লীগ সংবিধান সভা কিংবা বড়লাটের শাসন পরিষদ কোনোটাতেই যোগ দেবে না। সে নেবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ। একটা দিনও ধার্য করেন, নাম রাখেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস; খেতাবধারী মুসলমানদের বলা হয় ফিরিয়ে দিতে। জবাহরলালজী গিয়ে জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সহযোগিতা চান। জিন্না জবাহরলালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নারাজ হন। তা ছাড়া তাঁর ওই এক কথা। প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে মুসলীম লীগই মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর ত্রিশ বছর আগে ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস লীগ চুক্তি হয়েছিল সেটাও তো এই ভিত্তিতেই হয়েছিল যে মুসলিম লীগই মুসলিম পক্ষের প্রবক্তা আর কংগ্রেস হিন্দু পক্ষের। এবারেও সে রকম একটা চুক্তি হওয়া অত্যাবশ্যক, নয়তো কেন্দ্রীয় সরকার কীসের উপর দাঁড়াবে? নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মর্জির উপর? জিন্না দরজা বন্ধ করে দেন। জবাহরলাল অন্যান্য মুসলিম দল থেকে সহযোগী সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন। যাতে কেউ না বলতে পারে যে ভারতের স্বদেশী সরকার হচ্ছে আসলে হিন্দু সরকার।"[১৭]

প্রাবন্ধিক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন গান্ধীবাদী প্রফুল্ল ঘোষ সক্রিয় না হলে কলকাতাও হতো দ্বিতীয় লাহোর। তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গও হতো দ্বিতীয় পশ্চিম পাঞ্জাব, তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গও হতো দ্বিতীয় পূর্বপাঞ্জাব। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ। তবু গৃহযুদ্ধই ব্যাপক আকারে বাঁধত, যদি না গান্ধীজী থাকতেন ও জীবনযাপন করতেন। ''কিন্তু ততদিনে পরিষ্কার হয়েছে যে ব্রিটিশই একমাত্র শত্রু নয়। আরও এক শত্রুর সঙ্গে দরকার হলে লড়তে হবে। তার ঘাঁটি বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ। কংগ্রেসের এই তিন প্রদেশে না ছিল মেজরিটি, না ছিল সংঘশক্তি।"[১৮]

প্রাবন্ধিক মনে করেন আধুনিক যুগ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্রের উপযুক্তকাল। পাকিস্তানও একদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে। ''পনেরোই আগস্ট সকালবেলা আমাকে হাওড়ার নেতারা এসে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সেখানে পতাকা উত্তোলন করতে হয় আমাকেই।"[১৯]

প্রাবন্ধিক যুক্তবঙ্গের স্মৃতির শেষে এসে বলেছেন গান্ধীবাদীরা আজ কোথায়? অথচ তাঁদেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ''গান্ধীজী যে নৈতিক আদর্শ রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে রেখে যান আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? ভারতকে যাঁরা গান্ধীর দেশ বলে শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা আর করেন না। অথচ সে যে গ্রেট পাওয়ার হয়ে শ্রদ্ধা পাবে তাও নয়। তার আগে কমিউনিজমের পথ ধরে চীন গ্রেট পাওয়ার হয়ে উঠবে, ক্যাপিটালিজমের পথ ধরে জাপান গ্রেট পাওয়ার হয়ে উঠবে।

এশিয়াতে ভারতের স্থান কোনদিনই প্রথম বা দ্বিতীয় হবে না। হতে পারত, যদি সে গান্ধীপন্থা ধরে এগোতে পারত। সেটা এখন একটা বাঁধা বুলি। গঠনকর্ম আর সংগ্রাম ছিল গান্ধীজীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। গঠনকর্মহীন সংগ্রামবিমুখদের জন্যে গান্ধীবাদ নয়। অথবা নয় তাঁদের জন্যে যাঁরা কথায় কথায় অনশন করেন বা মিছিল বার করেন বা 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণা করে জেলে যান ও ছাড়া পান। বিলেতে যাকে বলে ইঁদুর বেড়াল খেলা। স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সবাইকে আত্মপরীক্ষা ও হৃদয় অনুসন্ধান করতে হবে।"[২০]

এবারে প্রাবন্ধিকের *আই.সি.এস.* গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার দরকার বলে মনে করি, কেননা এটি জীবন-স্মৃতিমূলক রচনা। এখানেও মিলবে জীবন দর্শনের চিত্র। ভারতে ব্রিটিশ রাজের শেষ তিন দশকের ঘনিষ্ট কাহিনী। অন্দরমহল থেকে জানা বৃত্তান্ত প্রাবন্ধিক এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে লিখেছেন। যে কাহিনী একই সঙ্গে ঐতিহাসিক সামাজিক ও প্রশাসনিক এর অভিনিবেশ দাবি করে অতি সহজেই। প্রাবন্ধিকের মতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের সম্বন্ধে একটা রসিকতা চলতি ছিল। ওঁরা না ইন্ডিয়ান, না সিভিল না সার্ভ্যান্ট। হোম সিভিল সার্ভিস কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিস; ফরেন সার্ভিস, কনস্যুলার সার্ভিস প্রভৃতি বিভিন্ন সার্ভিসের অন্যতম ছিল ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। বিষয়টি প্রাবন্ধিকের কথাতেই শোনা যাক— ''সিভিল কথাটার অর্থ অসামরিক। যেমন সিভিল ডিফেন্স, সিভিল সাপ্লাই, সিভিল এভিয়েশন। সিভিল সার্ভ্যান্ট বলতে বিলেতে ডাকঘরের কেরানীকেও বোঝায়। এদেশে প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা নিযুক্ত মুনসেফ, ডেপুটি ও সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও বিলেতে কিন্তু জর্জ ম্যাজিস্ট্রেটরা সিভিল সার্ভিসের সদস্য নন। আগেকার দিনে পুলিশের ইন্সপেকটার জেনারল, ডাকবিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারল, আবগিরি বিভাগের কমিশনার হতেন আই.সি.এস। সেখানে সবরকম কাজই সারা হত। আহার নিদ্রা শৌচ।"[২১]

মোট কথা *আই.সি.এস.* গ্রন্থটি খুচরো প্রবন্ধের চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশি রচিত। ধীমান দাশগুপ্তের ভাষায়— ''আই.সি.এস. গ্রন্থটি যতটা না কয়েকটা খুচরো প্রবন্ধের সমাহর, তার চাইতে বেশি একটা টানা গ্রন্থ, লেখকের আই.সি.এস. হিসেবে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রচিত। আই.সি.এস. সিস্টেমকে বলা হয়েছিল স্টিল ফ্রেম বা ইস্পাতের কাঠামো। কাঠামোটির তিনটি পায়া— অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, জুডিসিয়াল, কলেক্টরেট। স্টিল ফ্রেমে মধ্যমণি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তার নজর ছিল জুডিসিয়াল ভিন্ন অন্য সমস্ত বিভাগের উপরে। আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হলে যে দায়িত্বও কমিয়ে দেওয়া হয়। অথচ সরকারি নীতি নির্ধারণ করার ভার মন্ত্রীমণ্ডলীর হলেও সে নীতি কাজে পরিণত করার ভার কিন্তু

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ দায়িত্বশীল অফিসারদেরই। কিন্তু ক্ষমতা খর্ব করে কি কাঠামো রক্ষা করা সম্ভব? লেখক যখন প্রথমবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন তখন দেখেন তাঁর কনফিডেনশিয়াল বাক্সে একটা পুস্তিকা রয়েছে। তাতে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে আর্মিকে ডাকলে আর্মির কমাণ্ডারই হবে ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বড়। নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে তিনি কাজ করবেন, হুকুম দেবেন, ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার বিবেচনা অনুসারে নয়। অথচ সেই কমাণ্ডার হয়তো একজন লেফটন্যান্ট কর্নেল কি মেজর, ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে তাঁর র‍্যাঙ্ক নিচে। গান্ধীজী আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, সিভিল পাওয়ার বনাম মিলিটারি পাওয়ার এই দ্বন্দ্ব একদিন ভারতেও দেখা দিতে পারে। তাঁর প্রয়াণের পরে দেখা দিয়েছেও, কিন্তু ভারতে নয়, তার দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গে, পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। হতে পারে যে ইস্পাতের কাঠামোর সঙ্গে দেশবাসীর উপর অত্যাচার জড়িত ছিল। হতেও পারে যে স্টিল ফ্রেম হয়তো গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। অন্তত প্রাচ্য দেশে। কিন্তু স্টিল ফ্রেম না হোক, ফ্রেম তো একটা থাকবে। আইনের শাসনের জন্যই সিভিল সার্ভিস দরকার। মোগলরাও এটা বুঝত। তাদেরও একটা সিফিল সার্ভিস ছিল। স্টিল ফ্রেমের বিলয় ঘটলেও, এর দুটো কি একটা প্রথা যদি চলিত থাকে তাহলে গণতন্ত্রের দিক থেকে না হোক, জাতীয়তাবাদের দিক থেকে সুরাহা হবে। নয়তো নেশনটাই পড়বে ভেঙে।”[২২]

অর্থাৎ, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য রূপেই অন্নদাশঙ্করের কর্মজীবন। এই সার্ভিসের যাঁরা সদস্য হতেন তাঁরা নিযুক্তিপত্র পেতেন ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে। তাঁদের কভেনানটেড সিভিল সার্ভেন্ট ও বলা হত; কারণ তাঁদের চাকরি ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। এরকম প্রবাদও শোনা যায় যে ব্রিটিশ শাসনের প্রাণভোমরা ছিল আই.সি.এস. দের ইস্পাতের কৌটাতে। ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ চাকরি এটি। এই বইটি ভারতের আধুনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও দলিল।

এই আই.সি.এস. গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু ঘটনা এখানে তুলে ধরা হল। আই.সি.এস-দের এক ভাগ ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। আর একভাগ জর্জ। সেক্রেটারি যাঁরা হতেন তাঁরা মূলত ম্যাজিস্ট্রেট বা জর্জ। তবে— ‘‘আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গুলীও চালাতে হয়নি, জজ হিসাবে ফাঁসীও দিতে হয়নি। তবু বিভীষিকাটা আমাকে শেষ দিনটি পর্যন্ত তাড়া করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যখন মুর্শিদাবাদ জেলার ভার পাই তখন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ করতে হয়, কিন্তু গুলী চালনার উপলক্ষ ঘটেনি। ঘটতে পারত, যদি না আমি মন্ত্রীদের অলিখিত নির্দেশ অমান্য করতুম। আর সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত ও কর্মান্তরিত হতুম। কিন্তু ফাঁসীর মামলা যে আমাকে ছাড়তেই চায় না। আজ বাদে কাল আমি সরকারী কাজ থেকে মুক্তি পাব, মাঝখানে একটা রাতের ব্যবধান। তাও কি আমার কপালে আছে?

আমি তখন জুডিসিয়াল সেক্রেটারি। ফাঁসীর হুকুম অন্যজনের দেওয়া, অথচ চরমপত্র আমি সই না করলে জেলকর্তারা আসামীকে রাত্রিশেষে ফাঁসীতে ঝোলাবেন না। একে একে সব আপীল ও আবেদন খারিজ হয়েছে। আর একটা দিনও সবুর করা যায় না। আইনে নিষেধ আছে। আমাকে সেই রক্ত বর্ণের পত্রে তৎক্ষণাৎ সই করতে হবে। আমার জীবনে সে এক চরম মুহূর্ত। আমি না করলে যিনি চার্জ নেবেন তাঁর প্রথম কাজ হবে সই করা, কিন্তু তার ফলে ফাঁসী পিছিয়ে যাবে চব্বিশ ঘন্টা। আসামীর পক্ষে সেটা যমযন্ত্রণা ও আমার পক্ষে নির্মমতা। কোন্ যুক্তিতে আমি সই না করে চলে যাব? সই না করার কারণটাও তো লিপিবদ্ধ করতে হবে। কী সেই কারণ? প্রাণদণ্ডের নিমিত্তের ভাগী হতে বিবেকে বাধে, একথা লিখলে সেটা হতো দায়িত্বহীনতার একশেষ। উচ্চপদের অনুপযুক্ততার প্রমাণ। এমন সময় আবির্ভূত হন নোয়েল বারওয়েল, কলকাতা হাইকোর্টের অবশিষ্ট ব্যারিস্টার। অতি সজ্জন। বলেন, ''আমাকে আরো একবার সুযোগ দিন। প্রাণদণ্ড মকুব হতে পারে, এমনতর একটা ভরসা পেয়েছি।'' আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সেটাই বা কেমন করে লিপিবদ্ধ করি। নাছোড়বান্দাকে আমি আরো একবার সুযোগ দিই। গরজটা তো আমারও। সই না করার সুন্দর একটা অজুহাত মিলে যায়। কে জানে হয়েতো বেঁচেও যেতে পারে সেই আসামী। মরণের নিমিত্ত না হয়ে বাঁচনের নির্মিত্ত হওয়া ভালো নয় কি?''[২৩]

একি কম বড়ো জীবন দর্শনের অভিজ্ঞতা?— প্রাবন্ধিক বলেন— আদি পর্ব থেকেই ভারতীয় আই.সি.এস. দের জীবনে ছিল রাজভক্তির সঙ্গে দেশভক্তির গভীর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। ক্ষমতার হস্তান্তরে রাজভক্তির অবসান হলো। সেই সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বেরও অবসান এত্ত কী কম বড়ো জীবনদর্শন? প্রাবন্ধিকের মতে—

''কিন্তু আর সকলের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হলেও আমার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন হয় না। সরস্বতী আমার কাছে চান অসপত্ন সাহিত্যসাধনা। আর সরকার আমার কাছে চান একনিষ্ঠ পাবলিক সার্ভিস। জোড় মেলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতো আমারও একটা সিদ্ধান্ত না নিলেই নয়। তাঁদেরি মতো আমিও দীর্ঘসূত্রিতা করেছি। শেষে একদিন আমিও একটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীর হাতে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে বলি টস করতে। যদি মাথা ওঠে তবে ইস্তফা দেব। নয়তো আরো কিছুকাল চাকরি করব। মাথা ওঠে। তখন তাঁকেই দিয়ে আমার পদত্যাগপত্র টাইপ করাই। চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে জানাই যে আমার মোমবাতি যদি আমি দুইদিক থেকে পুড়তে দিই তবে সে বাতি অকালে নিবে যাবে। সাহিত্য যখন ছাড়তে পারব না তখন সাহিত্যকেই একান্ত করতে চাই।''[২৪]

প্রাবন্ধিক আরো একটি জীবন দর্শনের কথা আমাদের শুনিয়েছেন— ''আমার বন্ধু বীররাঘবন

বিলেতেই অশ্বারোহণ পর্ব সমাপ্ত করেন। কিন্তু সেটলমেন্ট ক্যাম্পে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় ঘোড়া ভড়কায়। তিনি পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান। প্রাণ হারান। আমার কয়েক বছরের জুনিয়ার সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেতে ঘোড়ায় চড়ায় পাশ করতে না পেরে দেশে ফিরে এসে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করেন। পেছন থেকে বাসের হর্ন শুনে ঘোড়া ভড়কায়। তিনি টাল সামলাতে না পেড়ে পড়ে যান। মাথায় চোট পেয়ে তিনিও প্রাণ হারান। সব চেয়ে ভালো বিলেতেই ও পাট চুকিয়ে দিয়ে আসা। কিন্তু আমাদের তো আরো অনেকগুলো বিষয় শিখতে হয়। যেমন দুই দেশের কাজ করতে হলে সে দেশের ইতিহাস, দুই দেশের অর্থনীতি, অপর প্রদেশে কাজ করতে হলে সে প্রদেশের ভাষা, সংস্কৃত জানা না থাকলে সংস্কৃত। তা ছাড়া ফোনোটিকস। আদালতে গিয়ে নোট লিখতে হয়, পরে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। তার উপর বার্ষিক পরীক্ষাও আছে। লিখিত পরীক্ষা। আমাকে লণ্ডনের চারটে শিক্ষায়তনে ক্লাস করতে হতো। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস, লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ।”[২৫]

প্রাবন্ধিকের মতে ইংরেজরা মানুষই ছিল। দেবতা ছিল না। দোষগুলোর কথা মনে রেখে কার কী লাভ? গুণগুলার কথা ভুলে গেলে যে আমাদেরই ক্ষতি। প্রাবন্ধিক ওদের চরিত্রে একটি বিশেষ গুণ দেখেছেন। ফেয়ার প্লে। সেইগুণটির উপর নির্ভর করে অহিংস অসহযোগ, গণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কল্পিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিকের মতে— ‘‘ইংরেজ রাজত্ব যে শেষ হলো এটা সুশাসনের ইস্যুতে নয়, স্বশাসনের ইস্যুতে। ভারতবাসীর স্বশাসনের খাতিরে ওরা ওদের শাসন গুটিয়ে নিয়ে অপসরণ করে। ইতিহাসে এর নজীর ব্রিটেন থেকে রোমান অপসরণ। দেড় হাজার বছর বাদেও ব্রিটেনের লোক রোমান যুগের উত্তরাধিকারকে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। ব্রিটিশ যুগের উত্তরাধিকারকেও ভারতের লোক সাদরে সঞ্চয় করবে।”[২৬]

চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবস্থানের কথাও প্রাবন্ধিক বলেছেন এইভাবে— ‘‘রহিত হলো চাকরিতে সংখ্যালঘুদের জন্যে একাংশ। মুসলিম সম্প্রদায় চল্লিশ বছর ধরে যা কিছু আদায় করেছিল সমস্তই হারালো। তার বদলে পেলো শুধু দুই টুকরো পাকিস্তান। জিন্না বললেন, এর নাম সেটলমেন্ট নয়, এর নাম আপোস। কংগ্রেস নেতারা বললেন, এটাই সেটলমেন্ট। গান্ধীজী জানতে চাইলেন, এটা কি চূড়ান্ত সেটলমেন্ট? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, এটাই চূড়ান্ত।

এরকম সমাধানে পাকিস্তানী মুসলমানদের লাভ হতে পারে, কিন্তু সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের লাভ হতে পারে না। তাঁদের তথা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ বলতে বিশেষ কিছুই রইল না; তাই স্বাধীন ভারতের মূলনীতি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। এ রাষ্ট্র সেকুলার। এর চোখে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেই সমান ভারতীয়। কেউ কারো চেয়ে কম ভারতীয় নয় বা বেশী ভারতীয় নয়।

যোগ্যতা দেখাতে পারলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মীরা অনুপাতের অতিরিক্ত কাজকর্ম আশা করতে পারবে। ধর্ম যার যার ঘরোয়া ব্যাপার, রাজনীতি বা অর্থনীতিক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা চলবে না।"[২৭]

যেবার প্রাবন্ধিক আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম হন সেবারের কথা তাঁর মুখ থেকেই আমরা শুনবো— ''সার্ভিস কথাটার মানে কি চাকরি? না, সেটারও কতরকম অর্থ। সোশিয়াল সার্ভিস বলতে বোঝায় সমাজসেবা। ডিভাইন সার্ভিস বলতে ব্রহ্মোপাসনা। ন্যাশনাল সার্ভিস বলতে যুদ্ধকালে কন্‌স্‌ক্রিপশন। সিভিল সার্ভিস বলতে অসামরিক রাজকর্ম। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষিকর্মণি তদর্ধং রাজকর্মণি। সেকালে যার নাম ছিল রাজকর্ম একালে তারই একভাগের নাম সিভিল সার্ভিস। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য এমন কী বিজাতীয় বা অপমানকর বা দমনমূলক ছিল যে তার সিভিল অংশটিকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা হাইয়ার জুডিসিয়াল বসাতে হলো? অথচ পাকিস্তান তা করেনি। সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান পুরোনো ছাঁচে ঢালা। সদস্যরা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে জজ হতেও পারেন, জজ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হতেও পারেন। বাংলাদেশেরও সেই ব্যবস্থা।"[২৮]

অর্থাৎ এখানে লুকিয়ে আছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নিটোল ইতিহাস।

এবারে আসবো প্রাবন্ধিকের লেখক হয়ে উঠার ইতিহাসের কথায়। সাতকাহন প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ *লেখক হওয়ার ইতিকথা*। এটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। লেখকের নিজের কথাই সাতকাহন। কেশবচন্দ্র কর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সারঙ্গধর দাস, সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র, যদুনাথ সরকার এঁদের সাহচর্যের মধ্য দিয়েই লেখকের লেখক হয়ে উঠার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর কথায়—

''একদিন তিনি (কেশব চন্দ্র কর) আমাকে পড়তে দেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'Epiphany' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক। অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত সেই পত্রিকাটি এই টোলের পণ্ডিতের কাছে নিয়মিত আসত। তিনি ছিলেন তার গ্রাহক। বার্ষিক চাঁদা মাত্রা চার আনা। তিনি বলেন, 'তুমিও গ্রাহক হয়ে পড়ো। দেখবে শেষপৃষ্ঠার এক কোণে তোমার নামও ছাপা হবে।" সত্যি তাই হলো। তারপরে দেখি সম্পাদককে যারা দুটি একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছে তাদে নামও ছাপা হয়েছে, প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরও হয়েছে মুদ্রিত। এ তো বড়ো রঙ্গ! তা হলে আমিও কি প্রশ্ন করতে পারি? করলে আমার প্রশ্ন আর আমার নামও কি মুদ্রিত হবে? কেশববাবু বলেন, 'হতে পারে, কিন্তু তা হলে তোমাকে ইংরেজী বাইবেল পড়ে প্রশ্ননির্বাচন করতে হবে।... অবাক কাণ্ড! আমার নামধাম হয়েছে প্রশ্নসমেত। উত্তর সমেত। কেশববাবু বিশ্বাস করতে পারেন না যে ওসব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে। ''আপনারা তো বলেন ঈশ্বর নিরাকার। কেউ তাঁকে চাক্ষুষ করতে পারে না। তাহলে যীশু কেমন করে বললেন যে অন্তর যাদের পবিত্র তারাই ধন্য, তারাই ভগবানকে

দর্শন করতে পারে।"[২৯]

'এপিফ্যানী'তে প্রকাশিত সেই প্রশ্নই লেখকের প্রথম প্রকাশিত রচনা। ছোটবেলা থেকেই প্রাবন্ধিকের ছিল নামের নেশা আর লেখার নেশা। লিখে নাম করার নেশা। একবার ওড়িয়া পত্রিকায় দয়ানিধি দাস ছদ্ম নামে একটা চিঠি লেখে নিজের ওড়িয়া রচনা ছাপার অক্ষরে দেখেন। কিন্তু সত্য বলার সাহস ছিল না বলেই নীরব থেকে ছিলেন। মিথ্যা বলার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। এরপর ধীরে ধীরে টলস্টয়ের *তেইশটি গল্প* লেখার পর তার জীবনের একটি মোড় পরিবর্তন হয়। মনে সাহস বাড়ে ধীরে ধীরে। যা মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল। এরপর শচীন্দ্রলাল দাস বর্মার "An anti-feminist cry-এর বিরুদ্ধে লিখেন— 'A Feminist Counter-cry'।

এরপর বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ পাঠ নেন যদুনাথ সরকারের কাছ থেকে। না হলে হয়তো *পথে প্রবাসে* লিখতেই পারতেন না। অন্যদিকে *পাটনার পাট* প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন— ''পাটনাকে আমি ছাড়তে চাইলেও পাটনা কি আমাকে ছাড়তে চায়? কমলী নেহী ছোড়তী। লণ্ডনে একে একে হাজির হয় কৃপানাথ, ভবানী, ফজলুর রহমান, বলভদ্রপ্রসাদ, রমণীকান্ত ঘোষ, স্বর্ণলতা ঘোষ, কৃপাসিন্ধু মিশ্র। কটক থেকে হরিহর মিশ্র, নৃসিংহ মহান্তি। সৈয়দ আমীন আহমদ তো আগে থেকেই ছিলেন। এলেন আমাদের হস্টেল সুপারিন্টেডেন্ট অধ্যাপক সৈয়দ আলী হাসান। এ কী! এ যে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী সশরীরে উপস্থিত! নাটকের উপর থীসিস লিখে ডক্টরেট পেতে চান। কিন্তু তার জন্যে থাকতে হবে দুটি বছর। চেহারা দেখে মায়া হয়। কোথায় সেই রুদ্র রূপ! বিদেশে বিভূঁইয়ে আমরাই তো তাঁর ভরসা। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে, বোধ হয় সংসারেও টান পড়ে। তিনি কিছুদিন পরে ফিরে যান। বলেছি পাটনা থেকে বোলপুরের টিকিট কাটি। ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়ি ফিরে গিয়ে করবার কিছু ছিল না। দিনগুনতে হতো কবে ফল বেরোবে। শন্তিনিকেতনের কর্তারা আমাকে পান্থশালায় থাকতে দেন। থাকি তিন সপ্তাহ। সে সময় যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে তাঁদের অন্যতম হলেন স্বনামধন্য প্রমথনাথ বিশী। কিন্তু তখনকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে বিশ্রাম করতে আসেন আই.সি.এস পরীক্ষায় আমার প্রতিযোগী নতুন আলাপী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার। দ্বিজেন প্রথম চেষ্টাতেই সফল হন। আমি তাঁদের কলকাতার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাড়ির ছেলের মতো আদর পাই। বিলেতযাত্রার প্রস্তুতি আমরা একসঙ্গেই করি। একই ট্রেনে যাবার কথা ছিল, বন্যার জন্যে কটক থেকে কলকাতায় পৌঁছতে পারিনে। বম্বেতে একত্র হই। আমাদের বন্ধুতা সারাজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। মাস কয়েক আগে আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে ফেলে স্বর্গে চলে গেছেন। তার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যান। তখনি তাঁর মুখে শুনি, ''এই বোধ হয় শেষ দেখা।'' আশ্বাস দিই যে আবার দেখা হবে। আমাদের বন্ধুতা অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছিল।

আজ আমি ওঁর আত্মার শান্তিকামনা করি। যা বলেছিলুম। শান্তিনিকেতন থেকে পুরী। পুরীতে কাকার বাড়িতে বসেই কাগজে পড়ি যে ১৯২৭ সালে সফল যাঁরা হয়েছেন তাঁদের শীর্ষে আমি। ষষ্ঠ দ্বিজেন আর নবম হিরন্ময়। বম্বেতে আমরা মিলিত হয়ে এক বিছানায় রাত কাটাই। পরের দিন এক জাহাজে যাত্রা করি।"[৩০]

আবার *আমার লেখকসত্তা* প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক স্বীকার করেছেন— ''বিভিন্ন ভাষার সেরা পত্রিকার সেরা লেখকদের রচনা পড়ে বাল্যকাল থেকেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার লেখক সত্তা গড়ে উঠে। গান্ধী টলস্টয়ের প্রভাবে পড়ে জনগণের জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে— ''ধীরে ধীরে আমার প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে সাহিত্যে যদি আমার তন্ময়তা না থাকে তবে একটি মাঝারি উচ্চতায় আমি উঠতে পারব, তার উপরে আর পারব না। একরাশ লেখাটাই পুরুষার্থ নয়। চাই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ। একটার পর একটা সোপান অতিক্রম। উচ্চতার থেকে অধিকতর উচ্চতায় উন্নয়ন। রাজকর্ম যদি অনুকূল না হয় তবে রাজকর্মই পরিত্যাজ্য। কিন্তু অ্যাকশনের আকাঙ্ক্ষা তখনো প্রবল ছিল। সেই ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে আর কী ভাবে করব? সাহিত্যিকের জীবনে কি শুধু লেখার অভিজ্ঞতাই থাকবে, জীবনের আর-দশটা দিক দেখার অভিজ্ঞতা থাকবে না? আর অভিজ্ঞতা যে সব সময় প্রীতিকর হবেই এমন নিশ্চয়তা কে দেবে? ইউরোপের লেখকদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। সেটা কি কম অপ্রীতিকর? প্রীতিকর হোক অপ্রীতিকর হোক নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে সাহিত্যিক নিতান্ত একদেশদর্শী হয় ও দর্শনের অভাব কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দেয়। আমার কর্মজীবন আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে।"[৩১]

তাঁর সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে। তিনি পরের মতো করে নয়, নিজের মতো করেই বলতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়— ''আমি জানি যে আমার কিছু দেবার আছে। যার কিছু নিজস্ব মূল্য আছে। যার কিছু নিজস্ব রূপ আছে। না দিয়ে আমার মুক্তি নেই। আমি যেন অন্তঃসত্তা নারী। দিয়েই আমি খালাস হব। তার আগে নয়। তার আগে আমাকে অতি যত্নে গর্ভরক্ষা করতে হবে। শিল্পীমাত্রেরই এটা কর্তব্য। আর্টের এটা দাবী। আদিকাল থেকে আজ অবধি যতগুলি সভ্যতার উদ্‌ভব হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিতে রিলিজনের পরেই আর্টের স্থান। যেখানে রিলিজন বিলুপ্ত সেখানেও আর্ট এখনো বিদ্যমান। যেমন মিশরে ও গ্রীসে। যেমন সিন্ধু উপত্যকায়। আমরা শিল্পীরা যদি তৎপর না থাকি তবে হাজার দুয়েক বছর বাদে এযুগের সভ্যতার কোন চিহ্ন থাকবে না।"[৩২]

প্রাবন্ধিকের প্রধান কাজ যদিও সৌন্দর্যসৃষ্টি ও স্বার্থকতাও তাই, তবুও প্রাবন্ধিক নিজের দেশের ও যুগের ভাবুক। তাঁকে অনেক সময়ই সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে ভাগ নিতে ও

দিতে হয়। নাহলে লোকে যদি পলায়নবাদী বলে। প্রাবন্ধিকের ভাষায়— ''মাঝে মাঝে আমি নিজেও বলি যে আমি পলায়নবাদী। নয়তো আমি একজন স্রষ্টা হিসাবে আত্মরক্ষা করতে পারিনে। আমার সৃষ্টিরক্ষা করতে পারিনে। তন্ময় হতে পারিনে। পলায়নটা সামাজিক দায়িত্বের থেকে পলায়ন, কিন্তু সাহিত্যিক দায়িত্বের থেকে নয়। বরং সাহিত্যের দায়িত্ব আরো একনিষ্ঠভাবে পালন করব বলেই পলায়ন। পরমহংসদেব বলতেন ডাকতে হয় মনে বনে ও কোণে। তেমনি বাণীর আরাধনা করতে হয় মনে বনে ও কোণে। জনগণের সামনে দাঁড়াতে হয় তারপরে।''[৩৩]

প্রাবন্ধিক পঞ্চাশ বছর বয়সে উপলব্ধি করেন সৌন্দর্য বলতে শুধু বহিঃসৌন্দর্যই শেষ কথা নয়, অন্তর সৌন্দর্যও বোঝায়। অন্তঃসার তো থাকবেই। দুটি নিয়ে সৃষ্টি। তিনি একটিরপর একটি সৃষ্টি করেন আর একটুর পর একটু মুক্ত হন। এক একটি সৃষ্টি যেন এক একটি জয়। একটার উপর একটা উচ্চতায় উন্নয়ন । তাই— ''শিল্পীকে যেমন করতে হয় গর্ভরক্ষা তেমনি মানবিকবাদীকে বা ধ্যানীকে করতে হয় বীজরক্ষা। চাষীরা যেমন বীজধান রক্ষা করে তেমনি আদর্শবাদীদেরও রক্ষা করতে হয় সেইসব আদর্শ যেসব পরে একদিন অঙ্কুরিত হবে, বিকশিত হবে, ফুটবে ও ফলবে।''[৩৪]

অন্যদিকে সাহিত্য জিজ্ঞাসায় তুলে ধরলেন ভালো লেখার আদর্শ সম্পর্কে— ''আরো ভালো লেখার খাতিরে যখন যেটুকু পরিবর্তন আবশ্যক হবে তখন সেটুকু করলেই চলবে। কিন্তু লেখা যদি আরও ভালো না হয় পরিবর্তন নিরর্থক। ভালো এক্ষেত্রে নীতির বিচারে নয়, রসের বিচারে, রূপের বিচারে। আমার উপরে পড়েছে রসের দায়, রূপের দায়। অন্য কথায় সত্যের দায়, সৌন্দর্যের দায়। এর উপরে শিবের দায় যদি চাপে সে ভার বইতেও আমি রাজী। কতবার বইতে হয়েছে। কিন্তু তার চাপে যেন আর্ট চাপা না পড়ে। জগতের ভালো করতে গিয়ে আর্টের মন্দ করতে আমি অনিচ্ছুক। আমার আর্টিস্ট সত্তাকে আমি রক্ষা করব। এটা প্রাথমিক।''[৩৫]

অপরদিকে *আমার জীবন দর্শন* নামক প্রবন্ধে বললেন— মানুষের ধর্ম কয়েকখানি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ধর্মের অভিজ্ঞতা একটি নিত্য প্রবহমান অভিজ্ঞতা। তিনি বিশ্ব স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি শক্তির একটি কণা প্রার্থনা করেছেন। যাতে তিনিও সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি বলেছেন—''এখন যীশুর সেই অনুশাসনের আমি এই অর্থ করি যে অপ্রেম দেখলে প্রেম দিতে হবে, অমঙ্গল দেখলে মঙ্গলকর্ম করতে হবে, অন্যায় দেখলে ন্যায়ের জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হতে হবে। নীরসতার মধ্যে রস আনতে হবে, কুরূপের মধ্যে রূপ। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ। অসত্যের মধ্যে সত্য। লেখনী যখন আমার হাতে দেওয়া হয়েছে তখন লেখনীকেও কাজে লাগাতে হবে।''[৩৬]

তিনি বলেন তাঁর দেশ, কাল, সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ, আন্তরে ও বাইরে যা আছে, প্রকৃতি, ভগবান ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত নৈতিক বিধান— সবাইকে নিয়ে তিনি এবং তাকে নিয়েই সবাই।

এই হল তাঁর জীবন দর্শনের মূলকথা। অন্যদিকে *আমার ধর্ম* নামক প্রবন্ধে তিনি যা বলেন, তাতে আর এক জীবনদর্শন। তিনি নতুন করে সত্যকে বরণ করেন। বরণ করেন সৌন্দর্যকেও, যা না হলে লেখা আর্ট হয় না বরণ করেন প্রেমকে, যা না হলে আর্ট হয় প্রেম হীন। প্রেম কেবল নরনারীর নয়, মানব প্রেম। তার থেকে ঈশ্বর প্রেম। তা না হলে প্রেমের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর ভাষায়— ''আমি মানবিকবাদী। ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরোধ দেখিনে। প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে বিরোধ দেখলে আমি মানবিকবাদকেই শ্রেয় মনে করি। জনপ্রিয় হতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি নেই। হলে ভালোই, না হলেও ভালো। ক্ষুরধার পন্থা। জনপ্রিয়তার খাতিরে বা অর্থপ্রাপ্তির জন্যে তার থেকে বিচ্যুত হওয়া আত্মরক্ষা নয়। আত্মাকে হারানো। সারা জগৎটাকে যদি আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পাই অথচ আপনার আত্মাকেই হারিয়ে ফেলি তা হলে আমার এমন কী লাভ হলো? যীশুর এই প্রশ্নটি আমি তেমনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যেমন করি মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? আমি আধুনিক মানুষ, ওঁরা কেউ আধুনিক ছিলেন না। কিন্তু ওঁরা যেসব প্রশ্ন রেখে গেছেন সেসব হলো চিরকালের প্রশ্ন। আর্টকেও সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একালের যতরকম সামাজিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্নের মতো সব চিরন্তন প্রশ্নেরও উত্তর থাকবে একালের সাহিত্যে। একালের কাব্যে উপন্যাসে নাটকে।''[৩৭]

আবার *শিল্পীর স্বাধীনতা* নামক প্রবন্ধে শিল্পীর মানদণ্ড সম্পর্কে সজাগ। যাঁরা নতুন কিছু বলতে চান বা লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টি করতে চান। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন লেখক ও শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে। ''আধুনিক যুগে একজন লেখক ও শিল্পীর কর্তব্য স্থির করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সবদিক বিবেচনা করে তাঁকে কাজ করতে হয়। যতক্ষণ না তিনি আত্মবিক্রয় করছেন ততক্ষণ তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েই থাকবেন। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা বিশেষ লাইন নেন নি বলে তাঁকে আমরা দোষ দেব না। তাঁর শেষ বিচার হবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের দ্বারা, তিনি যেটা করেন নি বা করতে পারেন নি, সেটার দ্বারা নয়।''[৩৮]

এবারে আসা যাক *স্রোতের দীয়া* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের সাক্ষাৎকারগুলির কথায়। প্রাবন্ধিকের সাক্ষাৎকারগুলি যেন জীবন স্মৃতিমূলক বহু বৃত্তান্ত এবং বহুতল, বহুবর্ণ ও বহুমাত্রায় ভরপুর। সাক্ষাৎকারগুলি দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে। যেমন— আবু আতাহার, মানব গঙ্গোপাধ্যায়, ধীমান দাশগুপ্ত, ড. অরুণ বাগচী, পারভেজ আহমেদ খান; শীতল দাস, মনিলাল দাস, পার্থচট্টোপাধ্যায়, রতনলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ। যেমন মানব গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রাবন্ধিক Ultimate truth সম্পর্কে বললেন— "Ultimate truth-কে শুধুমাত্র Intellect দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। Intellect-এর যে Highest flight সেও সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

তার জন্য দরকার হয় প্রধানত প্রেম, ''বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলাল।'' ভালোবাসা না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তেমনি Ultimate truth-কেও প্রেম দিয়েই পেতে হয়, সেই Ultimate truth-ই ভগবান। দ্বিতীয়ত, Intellect দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায় না, Intuition দিয়েই পৌঁছতে হয়।''[৩৯]

ধীমান দাশগুপ্তের সাথে সাক্ষাৎকারে ধীমান বাবুর প্রশ্ন—

> ''আমার শেষ প্রশ্নের বিষয় ঃ সাম্প্রতিক উপন্যাস 'ক্রান্তদর্শী'। ৩৫ বছর ধরে এই বই লিখবেন বলে তৈরি হয়েছেন, চার খণ্ডে লেখা হবে, জীবনের বড় একটা কাজ। প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন, তা পড়েওছি। বক্তব্য ও বিবরণ প্রধান। বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে একটা দেশের সন্ধিকালকে ধরতে গেলে বক্তব্যের কিছুটা প্রাধান্য ঘটবেই। সার্ত্রের Roads to Freedom উপন্যাসমালাতেও তা ঘটেছে, এতে কোন ক্ষতি নেই। 'ক্রান্তদর্শী'র যতটা পড়েছি তা পড়ে একটা অদ্ভুত মননশীল ও নান্দনিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। টেলিস্কোপে দূরের জগৎ দেখার মতো উত্তেজনাময় ও স্পন্দশীল এক অনুভূতি। বারাব্বাসের নায়ক যেমন অদৃশ্য নায়ক যীশুখ্রীস্ট, 'ক্রান্তদর্শী'র নায়ক তেমনি গান্ধী— 'The invisible hero', চার খণ্ড শেষ করতে সময় লাগবে। তার আগে এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কাঠামো সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে হয়।''

প্রাবন্ধিকের উত্তর—

> ''সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য ঃ এছাড়াও আরও একটা থিম বহুদিন ধরে আমাকে নাড়া দিচ্ছিল, তা হলে 'রিনিউয়াল'। একটা দেশের, একটা জাতির রিনিউয়াল। যা একটা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলতে হবে। যদ্দিন পারি এই থিমকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু শেষে দেখলুম আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, কেননা আমার কাছে যত তথ্য আছে তেমন আর কারুর কাছে নেই। তখন লেখায় হাত দিলুম। রিনিউয়ালের কোন বাংলা হয় না, শেষকালে তাই উপন্যাসের নাম রাখলুম 'ক্রান্তদর্শী'। একদিক দিয়ে দেখলে একে 'সত্যাসত্য'-এর সিকোয়েল বলতে পারো। তবে এতে মহাত্মাগান্ধীকে এনেছি। তাঁকে পরোক্ষভাবে রেখেছি এ বইয়ে, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আঁকার শক্তি আমার নেই, কারও আছে কিনা সন্দেহ। তেমন করে আঁকতে বহুকাল লেগে যাবে। পরোক্ষভাবে তাঁকে এনেছি, তাঁর উপস্থিতি নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে।''[৪০]
>
> সাক্ষাৎকার অরুণ বাগচীর সাথে।
>
> ''স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর পার হয়ে গেল। তবু চারদিকে এত অস্থিরতা অসন্তোষ

কেন?" প্রাবন্ধিকের বক্তব্য—

''আমার মনে হয় আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছি। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব প্রবণতা থাকে। তাকে অতিক্রম করে বা দমিয়ে রেখে অগ্রগতি সম্ভব নয়। জাপানে গিয়ে বারবার একথা আমার মনে হয়েছে। অতবড় একটা জাতি কেমন খণ্ডিতব্যক্তিত্ব হয়ে পড়েছে। সম্পদ উপচে পড়ছে, কিন্তু মনে সুখ নাস্তি। লম্ফ দিয়ে আমেরিকা বনতে গিয়ে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। আমরা ভারতীয়রা বস্তুত ক্রাফট এবং কৃষিমুখী জাতি। চলে গেছি দ্রুত শিল্পায়নের রাস্তায়। দেশের লোক সঙ্গে চলতে পারছে না। তাদের উপর জোর খাটাতে হচ্ছে। ওই জোর খাটাতে গিয়েই তো এমারজেন্সি আর সব কিছুর দরকার হচ্ছে। ডেমোক্রেসিতে জবরদস্তির জায়গা নেই— একটা এলেই আর একটা যায়। এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার।"[৪১]

অন্যদিকে শীতল দাস জোয়ারদারও মনিলাল দাশ এর সাথে সাক্ষাৎকার—

'কাজী নজরুল ইসলাম, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং কাজী আবদুল ওদুদ— এঁদেরকে আপনার কেমন লেগেছে?' প্রাবন্ধিকের বক্তব্য—

''কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল— বিশেষ বন্ধু আমার। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে অন্তরঙ্গতা। কাজী নজরুল ইসলামকে আমি কম দেখেছি। ১৯৩০ সালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে এসেছিলেন নজরুল গেরুয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরে। তখনই আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। নজরুল ছিলেন ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব, মুসলিম সমাজে মুসলমান। তাঁর কোন জাতধর্ম ছিল না। তিনি একদিকে লিখতেন ইসলামী গান, অন্যদিকে শ্যামাসঙ্গীত।"[৪২]

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে প্রাবন্ধিক যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর জীবন দর্শন ও কমবেশি উঠে আসে। সবুজপত্র থেকে কী পেলেন অন্নদাশঙ্কর। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে—

''বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্রে'র কাছে আমার উপনয়ন হয়েছিল। সেখানে যে মেসেজ পেয়েছিলুম সেই মেসেজই আমার মেসেজ। আমি মোট পাঁচটি শিক্ষা পাই 'সবুজপত্রে'র কাছ থেকে।

এক— যৌবন। যৌবনকে ধরে রাখতে হবে। দেহের যৌবন চলে যায় মনের যৌবন থাকে। আমাদের কাজ তাকে অক্ষয় করা। চিরকাল তরুণ থাকা। একথাই আমি 'তারুণ্য'তে বলেছি।

দুই— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়। শুধু প্রাচ্যতে পরিপূর্ণতা নেই। পাশ্চাত্য চাই।

তিন— 'চারইয়ারী কথা' থেকে চিরন্তনী নারী এই তত্ত্বটি পাই। জগৎ একটি নারী। শঙ্করাচার্য যেটি বলেছেন। পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতির বয়সের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু তিনি নিত্য নবীনা চিরন্তন মানেই সে নিত্য নতুন। নতুনকে ভালোবাসতে হবে, তার ভালোবাসা পেতে হবে। তারই প্রেরণায় ওপরে আরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। 'ফাউস্টে'র শেষ কথা। চিরন্তনী নারী আমাদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। এই ভাব এসেছে আমার 'কন্যা' উপন্যাসে। এই কথা সময় পেলেই আবার লিখব।

চার— আর্ট, এটাও পাই 'সবুজপত্রে'। এতদিন আর্টের মানে আমায় কেউ বলে দেয়নি। এর জন্যে আমি গ্রন্থের মাধ্যমে টলস্টয়ের কাছে গিয়েছি। সশরীরে রঁলা ও রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আর্ট হলো হায়ার ম্যাথমেটিস্কের মতো। বুঝতে হলে প্রস্তুতি চাই। বোঝার চেষ্টা করতে হয়। আর্ট সর্বজনবোধ্য নয়। রঁলা বলেন, আর্ট সকলের জন্যে। ইতালিতে রেনেসাঁসের সময় সবাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করেছে। উনি ভেবেছিলেন, আমি এলিত স্তরের লোক। টলস্টয় বলতেন, পিপল নিজেরাই আর্ট সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু 'আনা কারেনিনা' পড়ে আমি জেনেছিলুম এরকম মহৎ আর্ট যে সে লোকের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বড় মাপের জিনিসের জন্যে বড় মাপের সাধনা চাই।

পাঁচ— সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় লেখার শিক্ষা ও পাঠ 'সবুজপত্র' থেকে। বিশেষত বীরবলের দৃষ্টান্ত থেকে।"[৪৩]

এভাবেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সাহিত্য, সমাজ, সত্য ও জীবন দর্শনের কথা।

লেখকের আত্মজীবন মূলক ও আত্মশিল্পমূলক গ্রন্থ *বিনুর বই*। *বিনুর বই*-এর নায়ক বিনু লেখকের প্রতিরূপ না হলেও অনুরূপ কল্পরূপ— ভাবরূপ-প্রতীকী রূপ যে কোনোটি হতে পারে এবং প্রকৃতই লেখকের এই সমস্ত রূপের একটি সমবায় বিনু। যদিও আমরা বিনু চরিত্রটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'জীবনশিল্পী' গ্রন্থে। তিনি কীভাবে লেখক হয়ে উঠেছিলেন বিনুর বই তারই দলিল। লেখক নিজেই যদিও বলেছেন বিনু কিন্তু সব সময় তিনি (অন্নদাশঙ্কর রায়) নন। তাঁর মতোই একজন লেখক। মোট কথা যে কোন লেখকই নিজের বৃত্তি সম্পর্কে গভীর ভাবে ভেবেছেন কিংবা লেখক হয়ে উঠতে গিয়ে যাঁদের 'অন্তর-বাহির'-এ নানা রকম বোঝাপড়া করতে হয়েছে তার অনেক উত্তর পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। বিনু যেন সকল সৃষ্টিশীল ব্যক্তির দর্পণ। বিনুর বই দুটি পাঠের মধ্যে প্রথম পর্বে এক সাহিত্যিকের শিক্ষানবিশির বিবর্তনের ও চূড়ান্ত পরিণতির— বৃত্তান্ত। একদিকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্যদিকে লেখকের জীবনের ও মনের বিকাশেরও রূপান্তর বা সংক্রমণের

সাহিত্যিক-নান্দনিক রূপরেখা। বিনু অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে যতটা না বিষয় ও পদ্ধতি, তার চাইতেও বেশি অ্যাপ্রোচ বা প্রতিন্যাস। অন্নদাশঙ্কর— বিনু—'আমি' চরিত্র : এই তিন ধারার বিরহ-মিলনের ফলাফল দিয়েই অন্নদাশঙ্করকে বিচার করলে বোধ হয় জীবনদর্শন পরিষ্কার বোঝা যাবে। বিনুর বই, লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। তখন লেখকের বয়স চল্লিশ বছর। যৌবন তখনও অস্ত যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লিখলেন ছিয়াশি বছর বয়সে। তখন তিনি প্রায় সূর্যাস্তের কাছাকাছি। বইটি নামাঙ্কিত কয়েকটি ছোট ছোট অংশে। এক একটি নামই লেখকের জীবনের এক একটি থীম। যেমন— পোষা প্রাণী; খাঁচার পাখি, অমরত্ব, কর্তব্য, দোরেখা নীতি, জীবন যাপন, জীবন বেদ, নীতিবিচার, দ্বিতীয় পর্বে বিনুর পূর্বকথা, বিনুর উত্তর কথা, বিনুর প্রস্তুতি, বিনুর নিয়তি ইত্যাদি। এগুলি যেন কতগুলি সংকেত।

বিনুর বই-এর প্রথম পর্ব থেকে তাঁর শিক্ষা নবীশীর মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবন দর্শনের ইমারত গড়ে উঠল দেখা যাক। বিনুর কাছে সাধনার শেষকথা মোক্ষ। রসমোক্ষণ। তাঁর পিছনেই বিনুর লাগামহীন লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদ। সেই মাসিক পত্রের ছিদ্র দিয়েই লিখতে সাধ যায় বিনুর। কিন্তু মাসিক পত্র বন্ধ হলেও বিনু লিখবেই, না লিখে যে তাঁর মুক্তি নেই। আর লিখেও মুক্তি পায় না বিনু। কেননা, কেমন করে লিখবে? সে তো জানে না। যাও লিখে তাও নকলনবিশী। তারপর সবুজ পত্র থেকে আর্ট শব্দের সাথে তাঁর সখ্যতা জন্মায়। কথাটা মালার মতো গেঁথে যায় তাঁর গলায়, মনে। বিনু সেই মানুষ যে বুঝতে পেরেছে লেখক হয়ে উঠতে গেলে শুধু 'লিপিচতুর' হলে তো হবে না, 'জীবনচতুর'ও হতে হবে। যেমন— ''চতুর শুধু লিপিচতুর নয়। জীবনচতুর! রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর লিপিচাতুর্য জীবনের চাতুর্য। তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর। এক প্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়ায় না। একটু চমক লাগে এই যা। 'ঘরে বাইরে'র বা 'চার ইয়ারী'র চাতুর্য ওষ্ঠগত নয়। বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'মেঘদূতে'র চাতুর্যও তাই এমনি করে ক্লাসিকের প্রতি বিনুর কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু তার মনের ছাঁদ রোমান্টিক।"[৪৪]

বিনু স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে চায় সমান বিচার। আর নিজের লক্ষ্যে বিনু লালন করে একজন বিদ্রোহীকে। মানুষের বদ্ধমূল সংস্কারকে সে ভাঙতে চায়, গড়তে চায় নতুন ইমারত। বিনু স্বপ্ন দেখে নতুন সমাজের। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা বিনুর বৈশিষ্ট্য। বিনু চায় মানুষের সাথে মানুষের সম্প্রীতি। বিনু এমন এক সমাজ চায় যেখানে জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে। বিনু সাহিত্যের মধ্যে দেখাতে চায় সমগ্র মানব জীবনের রূপ।

বিনুর অস্থির, চঞ্চল, দেশ-বিদেশ বেড়ানো তাঁর আশৈশব সাধ। শুধু তাই নয়, মা ও ঠাকুমার সাথে বাল্যকাল থেকেই মন্দিরে যাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীতে তাকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসবান করে। সে সাকার বাদে আস্থা হারায় চিরকালের মতো। কিন্তু সৌন্দর্যের টানে লেখকের কথায়—

''ধর্ম বাদ দিলেও আমাদের সভ্যতার অনেকখানি থাকে, মন্দির তার কেন্দ্র। মন্দির বাদ দিলে ঐতিহ্য বাদ দেওয়া হয়, বিনু তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত নয়। সে সাকারবাদী না হয়েও হিন্দু, কারণ সে তার স্বদেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্যে যতটা নৈতিক সাহসের দরকার ততটা তার নেই। মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।''[৪৫] ঐতিহ্য সম্পর্কে বিনুর বক্তব্য যেন এক জীবন দর্শনের কথা শোনায়— ''বিনু যদি কোন দিন লেখাপড়া না শিখত, পেয়ারা গাছে বসে সারাদিন কাটাত, পুকুরের জলের দিনের বেলা সাঁতার কেটে সন্ধ্যা বেলা আবার ঝাঁপ দিত, তাহলেও রামায়ণ মহাভারত ও বৈষ্ণব কবিতা তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। তার ঠাকুমা তাকে মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলেছিলেন, মোটামুটি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বই পড়ে সে তার বেশি শেখেনি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গল্প দুটিও সে তাঁর মুখে শুনেছিল। বাড়িতে চণ্ডী পড়া হত সুর করে। বিনু প্রথমে ছিল শ্রোতা, পরে হল পাঠক। আর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী তো কীর্তনের সময় তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল। সেও হত দোহার। থিয়েটার, যাত্রা ও কথকতা তাকে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছিল। বিনা অধ্যয়নে। এর প্রভাব তার জীবনব্যাপী। অতীতের সম্মোহন তাকে স্বকালের প্রতি অচেতন করেনি, সে অতীত বলতে অজ্ঞান নয়, বরং অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্যে বর্তমান ভারতের এ দশা, এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে জানায়। নির্মমভাবে সমালোচনা করে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে, দেশ থাকবে বটে, কিন্তু দেশের মাটিতে রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রও নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মোষশালিনী সংস্কৃতি নেই। মিশরের যা হয়েছে। যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না। দেশের যেসব সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রাণে এই ছেদচেতনা রয়েছে বলেই তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোনো সৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা ইসাই হয়েছেন তাঁরা কিন্তু সূত্রচ্ছেদ করেননি। তাই 'মেঘনাদ বধ' সম্ভব হয়েছে। বিনুর জীবনে বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিদেশের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু তার স্বদেশের ঐতিহ্য থেকে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে, ততোধিক পুরাতন শিকড় থেকে সে তার আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত করেনি। ভারতের কবি-পরম্পরায়

বিনুও একটি মুক্তা। একসূত্রে গাঁথা।”[৪৬]

অন্যদিকে দোরোখা নীতি অংশে বললেন— ‘‘বিনুরও মনে হল তার কাজ বিদ্রোহ করে যাওয়া, ফল কতটুকু হবে তা ভেবে দেখবার সময় নেই। এমনি করে সাহিত্যের দিকে তার লেখনীর গতি।”[৪৭]

সমাজের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী বিনু। আবার কেন লিখবে, এর উত্তরে বিনু বলত কর্তব্য। নামের নেশা তার কম বেশি ছিল। কর্তব্যটা ছিল সামাজিক ও মানবিক। তাঁর ঝোঁকটা তখনও সাহিত্য সৃষ্টির উপর নয়, সমাজ সংস্কারের উপর, সংস্কার মুক্তির উপর। শ্রেণী সাহিত্য সম্পর্কে বিনুর বক্তব্য এই রকম— ‘‘বিনু বারবার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক। রাজারাজড়ার জীবন ঢের হয়েছে, অভিজাতদের জীবন যথেষ্ট হয়েছে, মধ্যবিত্তদের জীবন বলো জীবনের দৈন্য বলো তাও হয়েছে বিস্তর। আরো তো মানুষ আছে, তাদেরও তো রূপ আছে, সুর আছে, সুধা আছে। তাদের পরিচয় না নিলে, সাহিত্যে না দিলে, তারা হয়তো বঞ্চিত হবে না, কেন-না পড়ার জন্যে তাদের তাড়া নেই। কিন্তু আমরা তো বঞ্চিত হব, আমরা যারা পড়তে শিখেছি, পড়ে শিখি। আমাদের লেখকরা কেন আমাদের বঞ্চিত করে রাখবেন? কেনই বা সমগ্র জীবনের স্বাদ পাবেন না, পাওয়াবেন না? রামায়ণ মহাভারতের যুগে না হয় এর একটা কৈফিয়ৎ ছিল, তখন এত বড়ো পাঠক সম্প্রদায় ছিল না। এ যুগে তেমন কারো কৈফিয়ৎ আছে কি?”[৪৮]

রামায়ণ, মহাভারত বিনুর শিশু বয়স থেকেই প্রিয় ছিল। বিনুর জীবনে এমন একটি দিন এল যেদিন তাকেও মানতে হল আমি ঠেকেছি প্রণয়ের দায়ে, আমায় লিখতেই হবে। কিন্তু— ‘‘কেন লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, কার জন্যে লিখতে হবে, এসব পুঁথি পড়া মনগড়া প্রশ্ন এতদিন আসর জুড়ে বসেছিল, দায় যেদিন এল সেদিন বিদায় নিল অলক্ষে। তাদের জায়গায় বসল, লিখতেই হবে— শুধু এই একটি অনুজ্ঞা।”[৪৯] ধীরে ধীরে খুলে যায় হৃদয় গ্রন্থির দুয়ার। একদিনে নয়, একাধিক সহস্র দিবসে।

‘‘বিনু তার হৃদয়গ্রন্থি একে একে খুলল। এক দিনে নয়, একাধিক সহস্র দিবসে। তার অজ্ঞাতসারে একখানি গ্রন্থ রচিত হল, সে গ্রন্থের পাঠিকা মাত্র একজন। অথচ সেই একটি মাত্র পাঠিকার জন্যে লেখকের কী নিদারুণ অধ্যবসায়! নিজের লেখা তার না-পছন্দ হয়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। আবার লেখে। নিজের বিচারে যদি চলনসই হল পাঠিকা হয়তো ভুল বুঝলেন, অভিমান করলেন। তখন তাঁকে ঠিক বোঝানোর জন্যে, মন পাবার জন্যে, আবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়, ভাবতে ভাবতে রাত ভোর। লেখা যতক্ষণ না নিখুঁত হয়েছে, হৃদয় যতক্ষণ না স্বচ্ছ হয়েছে,

রস যতক্ষণ না মুক্ত হয়েছে, ততক্ষণ তার ছুটি নেই। বুকের রক্ত জল হয়ে চোখের দুকূল ভাসায়। শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথার্ত দেহমন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। একআধ দিন নয়। দিনের পর দিন। একটানা তিন বছর। তখন তো সে জানত না যে শুঁয়োপোকা মরে প্রজাপতি জন্মায় কত দুঃখে! ঐ তিনটি বছর যেন মৃত্যু ও জন্মান্তর। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় মেটামরফোসিস (metamorphosis)।"[৫০]

বিনু মনে করে লেখনী এক ধরনের বাঁশি। বাঁশি যে প্রেমের খেয়াতরী, একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়। বিনু মনে করেন বাঁচাটাও লেখা, আবার লেখটাও বাঁচা। তাঁর কাছে সৃজন হচ্ছে আত্মদান। আপনাকে দেওয়া। আবার লেখার মধ্যে যে ডিসিপ্লিন আছে সেটা বিনু ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। তবে— ''লেখা যে একটা ডিসিপ্লিন বিনু ক্রমে উপলব্ধি করল। সৈনিকের ডিসিপ্লিন এর চেয়ে কঠোর হতে পারে না, সুতরাং লেখকের জীবনও সৈনিকের জীবনের সমতুল্য। তার ঘোড়া নেই, কিন্তু ঘোড়ার দরকারও নেই। তার খোঁড়া চেয়ারটাই তার ঘোড়া। ভোঁতা কলমটাই তার সঙীন।"[৫১] এবং শেষে আরো বললেন— ''আর্ট ফর আর্টস্ সেক বলতে বিনু বোঝে এই তত্ত্ব। যাঁরা আর্টের কাছে কোনো একটা ফল দাবি করেন তাঁরা হয় তো প্রচলিত অর্থে পাটোয়ারী নন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল, দেবত্বের বিকাশ, ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, নৈতিক উন্নয়ন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি যত রকম ফল আছে সমস্তই লাভের তুলিকায় লাঞ্ছিত। সে পথে পথ চলার আনন্দ নেই।"[৫২]

তবে বিনু বিশ্বাস করে প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু'হাত খালি করে বিলানো। বিনু মনে করে— ''সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেই জন্যে বিনু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্ট যখন লক্ষ্য ভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্য ভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার। তখন তাকে সামাজিক মাপকাটিতে মাপতে পারো, হয়তো তাতেও সে ওতরাবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই নয়। আর্টের মানদণ্ড আর্টের ভিতরে। তাই তার সার্থকতা আর্ট হওয়াতে। আর যা-কিছু তা অধিকন্তু। অধিকন্তু ন দোষায়। তাকে দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল বা দেবত্বের বিকাশ হয়, যদি চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়, তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য সেটা নয়, উপায় তো নয়ই।"[৫৩]

কবিত্বকে কবিতা করাই বিনুর সাধনা। আবার আঙ্গিক সম্পর্কে বিনুর সচেতন কথা— ''বিনু আঙ্গিকের জন্যে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু অনঙ্গকে অঙ্গ দেবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। আঙ্গিক যদি এর থেকে স্বতন্ত্র হয় তো বিনু তার মহিমা বোঝে না। যদি এর অন্তর্গত হয় তো আঙ্গিকের প্রদি উদাসীন নয় সে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস রূপ, সুষমা, সুমিতি, অর্থবোধ, ব্যঞ্জনা। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, প্রত্যেক বাক্যের একটা ছন্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের একটা

ধ্বনি আছে। তার জন্যে কান তৈরি করতে হয়। যেমন বাইরের কান তেমনি ভিতরের কান। তারপর কান যে রায় দেয় সে রায় কলমকে মেনে নিতে হয়।"[৫৪] বিনু প্রেরণায় বিশ্বাস করে। সাধনায় বিশ্বাস করে, তাই তাঁর উক্তি— ''রূপ গুণ ও প্রাণচর্চা উত্তম, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে কী এক দুর্বার প্রেরণা, সে প্রেরণা জীবসৃষ্টির মূলেও। সে যখন আসে তখন বোবা মানুষ গান গেয়ে ওঠে, পঙ্গুর পায়ে নাচন লাগে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কবির শোক তখন শ্লোক হয়ে উড়ে যায় এমন অবলীলায় যে সকলের মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত। লোকের ধারণা বাল্মীকিকে এক মুহূর্ত ভাবতে হয়নি নিষাদের কাণ্ড দেখে। হয়তো তাই, কিন্তু তার আগে তপস্যা করতে হয়েছিল এক মনে। সে তপস্যা দিনের পর দিন। দৈনন্দিন। সে সাধনা বাণীর সাধনা।"[৫৫]

আবার প্রেরণার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। নিয়ে যাওয়ার ভার প্রেরণার উপর। আর পৌঁছে দেওয়ার ভার প্রজ্ঞার। যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা জাগেনি তাঁকে প্রজ্ঞার জন্য তপস্যা করতে হয়। আবার রিয়ালিজম অংশে বিনুর উক্তি— ''রিয়ালিটিকেই তার দরকার বলে রিয়ালিজমে অনাস্থা। মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড়ো মজার কথা যে, যারা মধু ভালোবাসে তারা গুড়ও ভালোবাসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়ালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিনু যে রিয়ালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তাড়িফ করে।"[৫৬] কিন্তু বিনু বলে খাঁটি রিয়ালিজম যত না দুষ্প্রাপ্য খাঁটি মিস্টিসিজম তার চেয়েও দুর্লভ।

অন্যদিকে বিনুর ছন্দ জিজ্ঞাসা বেশ গভীর। তাঁর কাছে আর্ট তথা ধর্ম ইনটুইশনমার্গী আর দর্শন বিজ্ঞান ইন্‌টেলেক্‌ট্‌মার্গী। বিনুর কথায়—''মানুষ কি কেবল বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহের দ্বারাই এক প্রকার ছন্দ রক্ষা করেছে? না, না। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে সত্তা। সে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নীহারিকার সাথী। সে চলে অণু পরমাণুর সাথে তাল রেখে। তাকে ডাক দিয়ে যায় শরতের মেঘ, বসন্তের হাওয়া। সে সাড়া দেয় বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে। গুহার গায়ে হিজিবিজি এঁকে। এমনি করে সংগীতের বিবর্তন, চিত্রকলার বিবর্তন হয়েছে। কাব্যের, ভাস্কর্যের, স্থাপত্যের। আর্ট এইভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আর্টের সঙ্গে সংগতি রেখে রিলিজন। কিংবা রিলিজনের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্ট।"[৫৭]

বিনুকে এগিয়ে যেতে হয় অনেক কন্টকময় পথ। তাই বিনু এসব কাটিয়েও প্রেমের দ্বারা অন্তরের বিকাশে বিশ্বাসী। তাই বিনু প্রতিবাদ করে ঘৃণ্য সমাজকে— ''বিনুর মনটা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে রয়েছিল তখনকার দিনে। যে সমাজ নারীকে সতী আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে একশ বছর আগে তার নীতিবোধের উপর বিনুর ভরসা ছিল না। ইংরেজরা চলে গেলে সতীদাহ প্রথার

পুনঃপ্রবর্তন হবে না, কে এ কথা জোর করে বলতে পারে! ইংরেজরা বহুবিবাহ করে না বলে ইংরেজি শিক্ষিতরাও করছে না। কিন্তু সামান্য একটু ছুঁতো পেলেই আর একটা বিয়ে করতে বাধে না। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখে খবরের কাগজে বহুবিবাহের জন্যে হাহুতাশও ছাপা হয়।"[৫৮] স্থির নীতি বলে অস্থির জগতে কিছু আছে কিনা বিনু দীর্ঘকাল তা অন্বেষণ করেছে। বিনুর কথায়—''সত্য অসত্য, প্রেম অপ্রেম— এরাও নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি। এদের ঘাত প্রতিঘাত যে কোনো ডিটেকটিভ নভেলকে হার মানায়, যদি লিপিবদ্ধ হয়। কোনো নাট্যকার কি এদের উপেক্ষা করতে পারেন? কিন্তু প্রচারকের মনোবৃত্তি নিয়ে নাটক বা নভেল লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই করেই তো লোকের বিশ্বাস নাশ করা হয়েছে। এখন হয়েছে উলটো ফ্যাসাদ। লোকের বিশ্বাস হয় না বলে কবিদের চোখে পড়ে না। যাঁদের পড়ে তাঁদেরও তটস্থ ভাব, পাচ্ছে কেউ বলে প্রচারক। তার চেয়েও বড়ো গালাগাল আদর্শবাদী।... তিনি বা তৎ, সগুণ ভগবান বা নির্গুণ ব্রহ্ম, দুই নন। এক। সেই এক আমাকে নিয়েই এক, আমার থেকে আলাদা হয়ে নয়। সেই একের মধ্যে সব আছে। সবই এক। একই সব। এ দুটি শব্দ সমার্থক। যখন বলি, এক, তখনি বুঝি, সব। সবাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে এক নয়।"[৫৯]

কিন্তু বিনু যে সৃষ্টিকর, সেজন্য সে সৃষ্টিকরের নেশায় মত্ত। এ বিশ্ব হাজার কুৎসিত হোক সৃষ্টিকরের চোখে তো সর্বাঙ্গসুন্দর। তবে বিনু যে এক সংকট-এর সম্মুখীন, তাঁর বাধা যে তাঁকেই কাটিয়ে উঠতে হয়— ''একদিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সীমাহীন প্রত্যয়। বিনু মন দিয়ে বুঝতে পারত না কী আছে, কী নেই। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সব আছে, এক আছেন। বুদ্ধি বলত, নেতি নেতি। স্বজ্ঞা বলত, ইতি ইতি। দর্শন বিজ্ঞান তাকে শেখাত ক্রিটিকাল হতে। কাব্য ও প্রেম শেখাত ক্রিয়েটিভ হতে। ক্ষুরধার পন্থা। কোনো এক দিকে একটু হেলান দিলেই অপঘাত দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলেছে, অথচ সংশয় মোচন হচ্ছে না। তখনকার দিনে অর্থাৎ তার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে কেউ যদি তাকে দরদ দিয়ে চিনত তা হলে একই দেহে দেখত দু জন মানুষকে। দু জনেই বিনু। কিন্তু দু জনের দুই মার্গ, দুই স্বভাব, দুই সাধনা। এ দুজনকে তফাত থেকে অনাসক্ত ভাবে দেখত আরো একজন বিনু। সে কোনো পক্ষে নয়। অপক্ষপাত। তার দেখার ধরন বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়মুখ বা অবজেকটিভ। অথচ যাদের দেখছে তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথক নয়। তাই তার দেখাটা প্রকৃতপক্ষে আত্মমুখ বা সাবজেকটিভ। সে তার আপনাকেই দেখত নাটকের বা উপন্যাসের দুটি চরিত্র রূপে। চরিত্র দুটি সে নিজেই। কিন্তু তাদের উপর তার কোনো হাত নেই। সে শুধু সাক্ষী। এবং লিপিকর। লিপিকরপ্রমাদ যদি ঘটে তো তার অজ্ঞাতসারে। ঘটা বিচিত্র নয়, কারণ চরিত্র এবং চরিতকার একই ব্যক্তি।"[৬০] এভাবেই বিনু কবি থেকে ঔপন্যাসিক হয়।

এভাবেই বিনু হয়ে উঠে ঔপন্যাসিক। যে কোনো রচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিনুর সাবধানবাণী নিঃস্পৃহ হওয়া। যেমনটা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কিন্তু উদাসীন হলে চলবে না। সংকল্প করতে হবে, সাধনা করতে হবে; প্রীতির দেনা শেষ করতে হবে। বিনু বলে— ''এই যে আমি আপনাকে পাচ্ছি এই আমার পুরস্কার। আমার পুরস্কার আত্ম আবিষ্কার।''[৬১] আর সেটা অন্তরের পূর্ণতা দিয়ে ভরে নিতে হয়। এভাবেই গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতাবোধ দিয়ে বিনুর যাত্রা শুরু। শেষ পর্বে এসে বিনু বলে শেষ নয়, অশেষ। বিনুর কথায়— ''যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা'' তেমনি বলা ও না বলা। যত বলতে হয় তত হাতে রাখতে হয়। নিঃশেষে বলার মতো ভুল আর নেই। তোমরা আধুনিক সাহিত্যিকরা বকতে জান, চুপ করতে জান না। এত উঁচু গলায় কথা কও যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। তাতে তোমাদেরও গলা ফাটে, বিশ্বেরও তাল কাটে, শান্তিভঙ্গ হয়।

ভুলে যেয়ো না, চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্যে নয়। শব্দ দেওয়া হয়েছে নিঃশব্দতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা ও পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।''[৬২]

দ্বিতীয় পর্বে সেই জীবন কথাই উঠে এসেছে। যা পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু তাঁর জীবন দর্শনের রূপ দেখার চেষ্টা করবো। বিশ্বজগৎকে যা ধারন করে আছে, সেই শ্বাশ্বাত বিধানই ধর্ম। বিনুর মতে— ''ধর্মের সারবস্তু ছেড়ে তার খোলসটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৌলবাদ। যেমন— মুসলিম আরবে, ইরানে, পাকিস্তানে তেমনি হিন্দু ভারতে। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ জনতা গভীর কর্দমে পতিত হচ্ছে; তবে চিরকালের জন্য নয়। মানুষের স্বয়ং সংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে। একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।''[৬৩]

অন্যদিকে *আর্ট* গ্রন্থের অনেক প্রসঙ্গই প্রাথমিক ভাবে বিনুর বইয়ে আলোচিত হয়েছে বলে নতুন করে আর এই গ্রন্থের বিশ্লেষণ এখানে করা হলো না। শুধু এতটুকু আমরা জানবো সবকিছু নিয়েই আর্টের আপন সংসার। শিল্পী শিল্পে কী বলেছে ও কেমন করে বলেছে সঙ্গে কে বলেছে তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষৎ সম্ভাবনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না বলেই প্রাবন্ধিক সাম্প্রদায়িকতার, অশিক্ষার, অপসংস্কৃতির সংহতিহীনতার ঘনায়মান অন্ধকারের আলোকবর্তিকা। তাঁর আলো দেবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এই হল অন্নদাশঙ্করের জীবনদর্শনের নির্মাণ। এ যেন জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে জীবনবোধ গড়ার ফ্রেমে জীবনদর্শন নির্মানের অন্বেষা।

তথ্যসূত্র:

১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্য ১৪০৯, পৃ. ৩৩৯

২. ঐ, - পৃ. ৩৪০

৩. ঐ, - পৃ. ৩৭৬

৪. দাশগুপ্ত ধীমান - চিরহরিৎ বৃক্ষ অন্নদাশঙ্কর, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৯৯-১০০

৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্য ১৪০৯, পৃ. ৩৪৭

৬. ঐ, - পৃ. ৩৫৫

৭. ঐ, - পৃ. ৩৫৯

৮. ঐ, - পৃ. ৩৬০

৯. ঐ, - পৃ. ৩৭১

১০. ঐ, - পৃ. ৩৯০

১১. ঐ, - পৃ. ৪০৫

১২. ঐ, - পৃ. ৪০৯

১৩. ঐ, - পৃ. ৪১১

১৪. ঐ, - পৃ. ৪১৮

১৫. ঐ, - পৃ. ৪১৯

১৬. ঐ, - পৃ. ৪১৯

১৭. ঐ, - পৃ. ৪২০

১৮. ঐ, - পৃ. ৪৩৩

১৯. ঐ, - পৃ. ৪৩৬

২০. ঐ, - পৃ. ৪৪০

২১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ

১৪০৬, পৃ. ৫৭৭

২২. ঐ, - পৃ. ১৪-১৫

২৩. ঐ, - পৃ. ৫৮৬-৫৮৭

২৪. ঐ, - পৃ. ৫৮৫

২৫. ঐ, - পৃ. ৫৭৩

২৬. ঐ, - পৃ. ৫৬৯

২৭. ঐ, - পৃ. ৫৪১

২৮. ঐ, - পৃ. ৫২৬

২৯. ঐ, - পৃ. ১৫৪

৩০. ঐ, - পৃ. ১৭১-৭২

৩১. ঐ, - পৃ. ৯৩

৩২. ঐ, - পৃ. ৯৪

৩৩. ঐ, - পৃ. ৯৫

৩৪. ঐ, - পৃ. ৯৪

৩৫. ঐ, - পৃ. ১০৪

৩৬. ঐ, - পৃ. ১০৭

৩৭. ঐ, - পৃ. ১১০

৩৮. ঐ, - পৃ. ১২০

৩৯. ঐ, - পৃ. ৪৭৮

৪০. ঐ, - পৃ. ৪৮৯

৪১. ঐ, - পৃ. ৪৯২

৪২. ঐ, - পৃ. ৫০০

৪৩. ঐ, - পৃ. ৫০৯-১০

৪৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৯

৪৫. ঐ, - পৃ. ২২

৪৬. ঐ, - পৃ. ২৪-২৫

৪৭. ঐ, - পৃ. ৩১

৪৮. ঐ, - পৃ. ৩৫

৪৯. ঐ, - পৃ. ৩৮

৫০. ঐ, - পৃ. ৩৮

৫১. ঐ, - পৃ. ৪৭

৫২. ঐ, - পৃ. ৪৮

৫৩. ঐ, - পৃ. ৪৯

৫৪. ঐ, - পৃ. ৫০

৫৫. ঐ, - পৃ. ৫১

৫৬. ঐ, - পৃ. ৫৪

৫৭. ঐ, - পৃ. ৫৯

৫৮. ঐ, - পৃ. ৬০

৫৯. ঐ, - পৃ. ৬৪-৬৫

৬০. ঐ, - পৃ. ৬৭

৬১. ঐ, - পৃ. ৬৭

৬২. ঐ, - পৃ. ৭১

৬৩. ঐ, - পৃ. ১৬৩